দেশের বৃহত্তম পাখি পর্যটন কেন্দ্র হতে পারত ডুয়ার্স!

রাজ্যের নয়া পর্যটন নীতি স্বাগতম

কোচবিহার থেকে কালিম্পং হোক প্রথম ইকো টুরিজম সার্কিট

লোগো চাই ডুয়ার্স চায়ের

শেরপাদের নিয়ে প্রথম গবেষণা

এখন ডুয়ার্স

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮। ১২ টাকা

বেলাকোবার চমচম

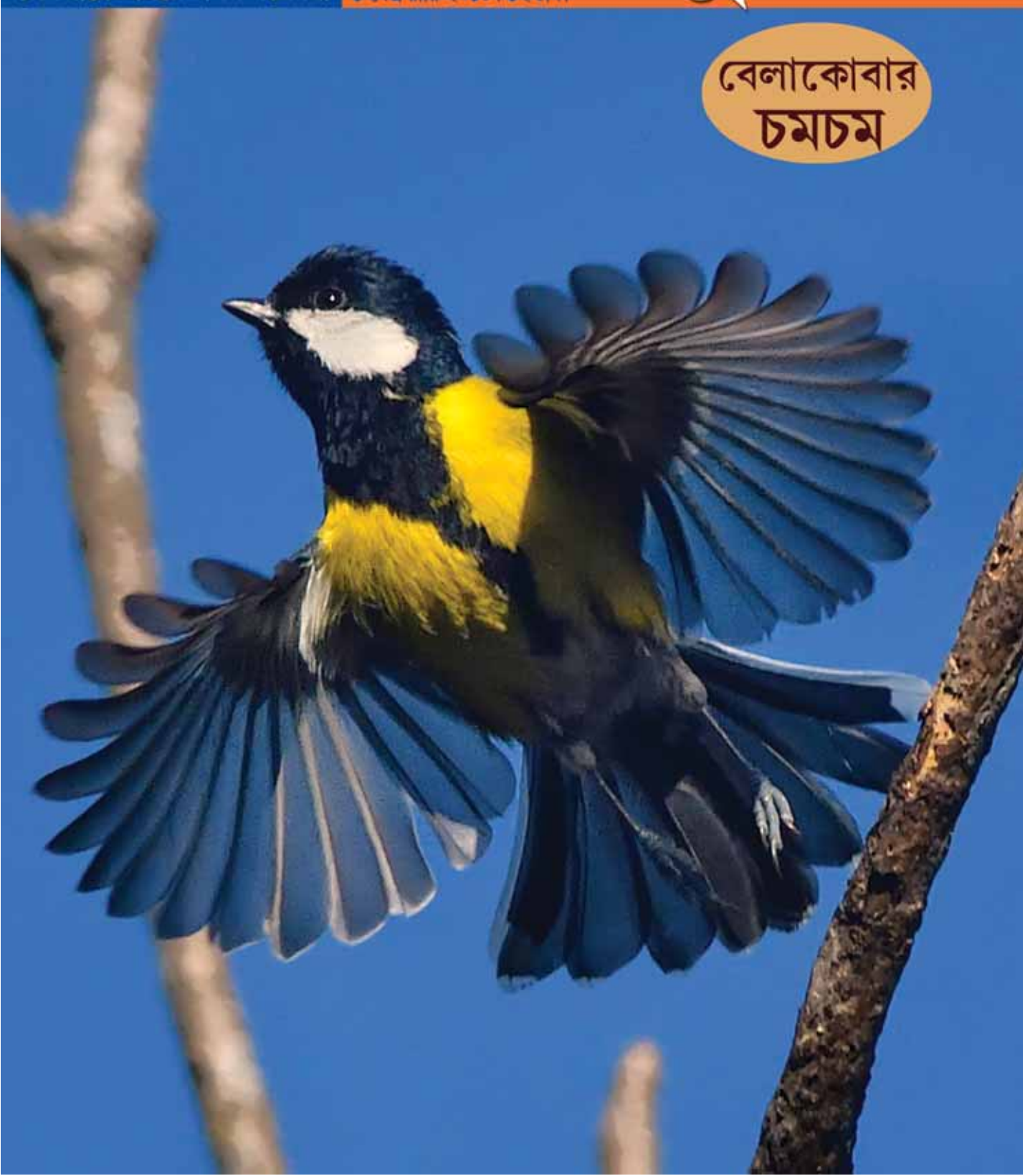

স্বাগতম

নতুন বছরে জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

এন ইউ এল এম

- শহরের গরীব মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর দলগঠন।
- স্বনির্ভর দলের ১.২৫ লাখ ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ পরিষেবা প্রদান
- স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত ঋণের ব্যবস্থা করা
- শহরের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
- শহরের আশ্রয়হীনদের জন্য ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন। প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা।**

প্রকাশিত হতেই সাফল্য

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী

গত এক বছরে ডুয়ার্সের চা-শিল্পের পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সরেজমিনে বাগান ধরে ধরে ঘুরে দেখে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। অবনতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যেমন ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে চায়ের দূরবস্থার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশাল মাফিয়া চক্র, তারও ইঙ্গিত মিলেছে বহু জায়গায়। এই সংকলনে ধরা পড়েছে এক অবিশ্বাস্য যুগ। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এই বইটি সাড়া জাগাবে কোনও সন্দেহ নেই। **১১০ টাকা**

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি
দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির চর্চার পটভূমি একদিন বদলে গেল। পরিস্থিতির চক্রে ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, তারপর রাজীব গান্ধীর বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলের হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কাটাবার অভিজ্ঞতা হল, পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়ার সুযোগও। দীর্ঘ ২৬ বছরের উত্তরবাংলা, কলকাতা হয়ে দিল্লি তথা গোটা দেশের রাজনীতির ছবি ধরা পড়েছে জনপ্রিয় নেতার কলমে। **১৫০ টাকা**

পাওয়া যাচ্ছে: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ডুয়ার্স মেল
নতুন বছরের চিঠি

হাড় কাঁপানো পশ্চিমী হাওয়ার দমকায় উল্টে গেল ক্যালেন্ডারের পাতা, বয়ে নিয়ে এল আনকোরা নতুন বছর। মজ্জায় বইতে থাকা পুরনো ক্লেদ-স্রোত ধুয়ে ফেলতেই যেন গেলাসে গেলাস ঠুকি, আর সবাই মিলে চেঁচিয়ে বলি, নয়া সাল মুবারক, হ্যাপি নু ইয়ার, উল্লাস! আসলে কিন্তু অভিমন্যুর মতই চক্রব্যূহে আটকে আমরা, সংসারের কুটিল নাগপাশে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে ক্রমশ। নতুন বছর যেন একটা মুক্তির জানালা, কিংবা নিছকই এক অজুহাত! কিংবা পলায়ন! নাকি যুগ যুগ ধরে চলে আসা অভ্যেস! সে যাই হোক, তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের একঘেয়েমি কাটাতে নতুন বছরের জুড়ি নেই, ইংরেজ সাহেবরা যে তা অনুধাবন করেছিলেন বহুদিন আগেই, সে সত্য প্রমাণিত হয় প্রত্যেক পয়লা জানুয়ারির আগমনী মধ্যরাত্রে। বাকি পৃথিবীর মতই প্রত্যন্ত ডুয়ার্সভূমিতেও আমরা সোল্লাসে উদযাপন করি নিউ ইয়ার।

অথচ নতুন বছরের পদার্পণে আমাদের দূর্দশার সীমা নেই। ঘন কুয়াশার জালে অদৃশ্য হয়ে যায় ডুয়ার্সভূমি, বিমান ওঠানামায় বিঘ্ন ঘটে, দূরপাল্লার ট্রেন পৌঁছয় অস্বাভাবিক দেরিতে, মানুষের কষ্টের সীমাপরিসীমা থাকে না এসময়! বাকি দুনিয়া থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমরা। ভিন গ্রহ থেকে খোঁজ নিতে থাকি পরবাসে থাকা নিজেদের সন্তানদের! এই ঠান্ডায় আর বেরোস না বাবা! গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিস কিন্তু! এখনও ফিরলি না মা! সন্ধে হয়ে গেল যে! অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে বুক, নারায়ণ রক্ষা কোরো ওদের!

নতুন বছর আসলে আমাদের শিখিয়েছে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে! বাকি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরুপদ্রব ঘুম। কিন্তু একে যদি বঞ্চনার সুযোগ বলে ধরে নেওয়া হয় তবে তা সভ্যতার চরম ভুল! কারণ আজ হোক কাল জেগে উঠবেই আমাদের চেতনা, আমাদের আগামী প্রজন্ম। কৈফিয়ত চাইবে, ফিরে পেতে চাইবে নিজেদের অধিকার পাওনাগন্ডা! এ কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই, কোনও শর্টকাট নেই! পৃথিবীর বাকিদের মতই আমাদেরও তাই নতুন বছর মানে প্রত্যেক হৃদয়ে অঙ্কুরোদগম নতুন দিনের।

দুর্বৃত্তেরা শীতের কুয়াশার মতই ঘিরে রেখেছে আমাদের দিনরাত্রি, অজস্র সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ আমাদের প্রগতি। আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখার অপপ্রচেষ্টা বহুদিনের, বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে অনর্থক হয়রানিকে দূর্ভাগ্য বলে চালাবার সে অভিসন্ধি ধরা পড়ে যাওয়ার মুখে। এসময় আমাদের প্রার্থনা থাকে একটাই, হে কালপুরুষ, রক্ষা কোরো আমাদের ভবিষ্যত আমাদের উত্তরাধিকার! অরণ্যাকীর্ণ নদীময় এ ভূমিতে শ্বাপদের মুক্তাঞ্চল ভেবে যে দস্যুরা শাসন করে গিয়েছে এতকাল, তাদের নিশ্চিহ্ন করবার অর্জুন-প্রতিজ্ঞায় বড় হচ্ছে আমাদের সন্ততি। প্রতি নববর্ষেই কাল গুনে চলি আমরা, এইবার বুঝিবা সেইদিন সমাগত! গভীরতম নিদ্রাতেও আমরা প্রতীক্ষায় থাকি সেইদিনটির। নতুন বছর নতুন ক্যালেন্ডার মানেই আমাদের ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকার প্রহর।

আজও আমাদের অভিভাবকত্বের ইজারা নিয়ে রেখেছে যে অমানবের দল, নতুন বছরে তাদের প্রশ্ন করি, যে দুঃসাহসে নদী পেরিয়ে এতকাল অবাধ মৃগয়া চালিয়ে গেলে অবোধ ভেবে, কাল নতুন সূর্য ওঠার রোদ্দুরে তার ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকবে তো? উন্নতির বাহানা নিয়ে যারা ফিরে ফিরে আসো আমার চারণভূমিতে, সাবধান করে দিই তাদেরও, ব্যস অনেক হয়েছে! অকারণ অনুদান আর নয়, বদহজম বমি হয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে আমাদের কাঁথা-কম্বল ঘটি-বাটি। অনাকাঙ্খিত যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাতে আলের ধারে ফুটপাথে, যে ভ্রূণ পল্লবিত কিশোরী হয়েও রক্ষা পেল না, সেসব অনাদায়ী সুদের হিসেব বুঝে নিতে ফিরে আসবে কি কখনও? আজ আমাদের পাহাড়ে যে আগুন জ্বলে তাতে ঘৃণা মিশে আছে কতটুকু তা কি খোঁজ করে দেখার দুঃসাহস দেখিয়েছ কেউ? কিংবা আজ আমাদের চা বাগানের স্বর্গে যে মারণপোকার প্রাদুর্ভাবে মহামারী তা নিরাময়ের সৎসাহসটুকু? উচ্ছিষ্টের ভাগ নিয়ে কলহ করে নেতা-পোশাক পরিহিত কিছু অবাঞ্ছিত অর্বাচীন, কারণ তারা পড়তে শেখে নি দেওয়াল-লিখন। তাদের দেখে পুলকিত হয়ো না, হে অনাহুত পর্যবেক্ষক, এইবেলা গুটিগুটি কেটে পড়াই মঙ্গল, কারণ কৃষ্ণপক্ষ সমাগত। তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে!

চতুর্থ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা,
১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
তরাই-ডুয়ার্স পরিক্রমা
লোগো চাই ডুয়ার্স ব্র্যান্ডের ৪
পৌষে পার্বণমুখর মালবাজার ১০
জলপাইগুড়ি বইমেলা আসছে ১১
বর্ষশেষের আড্ডাগান ১১
উত্তরপক্ষ ১২
প্রচ্ছদ নিবন্ধ
ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১৫
রাজ্যের প্রথম ইকো টুরিজম সার্কিট ২২
পাখি পর্যটন কেন্দ্র হতে পারত ডুয়ার্স ২৫
বেলাকোবার চমচম ৩৪
পালাগানের আসর ৩৯
শ্রীমতি ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ৩১
বুক পকেটে মদনমোহন ৩১
শেরপাদের নিয়ে প্রথম গবেষণা ৩২
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৫
শালবনে রক্তের দাগ ৪৪
তরাই উৎরাই ৪৯
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৫৬
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৫১
ডুয়ার্সের হেথা হোথা ৫৩

প্রচ্ছদ ছবি: গ্রিন ব্যাক্ড টিট, বিরূপাক্ষ মিত্র

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বাঘের অঙ্ক

কান্ড হলো বটে মেখলিগঞ্জে গো! সে-ই কবে সেখানে তিস্তা বেয়ে বাঘ আসত তা ছিল 'মিথ'। এলাকার পাব্লিক তাই আর দশ রকম ভয় পেলেও বাঘ নিয়ে চাপ নিচ্ছিল না। তারপর এলো বাঘ! পাক্কা ছত্রিশ ঘন্টা তল্লাটে সন্ত্রাস করে প্রমাণ করে দিল একটু পাওয়ার থাকলে কী করতে পারত! তা গোড়ায় মূর্ছা গেলেও পাব্লিক শেষমেশ বনকর্তাদের নিয়ে আসরে নেমে সিদ্ধান্তে আসে বাঘকে গুলি করে কুম্ভকর্ণ করে দিতে হবে। তার জন্য দরকার বাঘকে কাছাকাছি জঙ্গলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। তা বাঘ তো গরু নয় যে হ্যাট হ্যাট বললেই চলে যাবে। তখন সিদ্ধান্ত হলো এক্সকেভেটরে চেপে তাড়া করা হবে বাঘাকে। হলোও তাই। সামনের দিকে হাতওয়ালা বিদঘুটে জানোয়ার দেখে বাঘা সোজা জঙ্গলে। তারপর ঘুম পাড়ানি বুলেট। তারপর বাঘের নিদ্রা। গুজবে প্রকাশ, বাঘ ঘুমিয়েছে কি না দেখতে গিয়ে চারজনের মধ্যে তিনজন আহত হয়েছিল। জাগরণ দশায় বাঘ আসলে চড় মেরেছিল একজনকেই। সব মিলিয়ে আহত চারজন। বাঘের অঙ্ক এমনই হয়।

হাড়ানশন

এর মানে কত্তা 'হাড় ভেঙে অনশন'। জলপাইগুড়ির এক বয়স্ক মহিলার হাতের হাড় গেল ভেঙে। আনা হলো সুপার হাসপাতালে। সেদিন ডাক্তার না থাকায় পরদিন আবার হাসপাতালাগমন, ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষণ এবং

জানা যায় যে হাড় ভেঙেছে হাতের। তার পরের দিন অপারেশন হেতু মহিলাকে সকাল থেকে অনশনে থাকার নির্দেশ। অতঃপর হাড় জোড়ন। বেলা বারোটায় ওটি থেকে বেরিয়ে আসার পর বেডে গমন। তা কত্তা, এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু সকাল থেকে অনশনে থাকার দরুন রোগীর খিদে পেয়ে গেছে। মা কী খাবে তা জানতে গিয়ে ছেলে শুনল এক ভারি আশ্চর্য কথা! ডাক্তার নাকি তিন দিন কিছু না খেতে বলেছেন! হাড় ভাঙায় তিনদিন খাওয়া স্টপ? এমন কি কেউ শুনেছে? কী বলব কত্তা, ডাক্তারের আদেশকে অজুহাত করে রাত ন-টা পর্যন্ত রোগীকে কিছুই খেতে দিল না গো! তারপর রোগী কাহিল হয়ে যাচ্ছে দেখে শুরু হলো লাফালাফি! ডাক্তারকে ডাক! খোঁজ নে! অদ্ভুত নিয়মতান্ত্রিক রোবটের দেশ কত্তা! হাড় জোড়ায় তিন দিন অনশনে থাকাটা যে ভৌতিক নিদান,

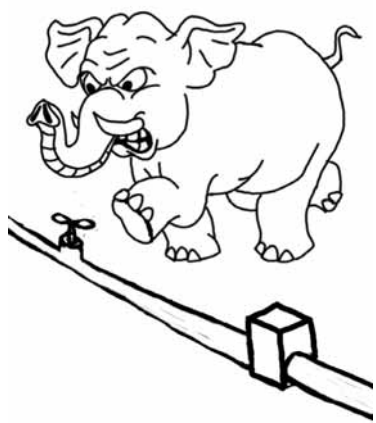

তা বোঝার জন্য ডাক্তার হতে হয় না। কিন্তু হাসপাতালের বুঝতে সময় লাগে।

নবপ্রবাদ

কথায় বলে 'গরীবের ঘরে হাতির বাড়া'। এবার গরীবের বদলে চা-বাগান লিখতে হবে। এমনিতেই রামঝোরা চা-বাগান অসুস্থ। রুগ্ন হয়ে গেছে বেচারা! নামের শুরুতে রাম থাকলেও লাভ হচ্ছে না। তদুপরি হাতিরা পরিকল্পিত হামলা চালিয়ে হাল আরো খারাপ করে দিচ্ছে। মাত্র দেড় মাস আগে দল বেঁধে চুপিচুপি বাগানের জলসেচ ব্যবস্থাটা বুঝে নিয়ে লাখ তিনেক টাকার পাইপ ফাটিয়ে চলে গিয়েছিল। সেটা সামলাতে না সামলাতেই আবার হানা। এবার লাখ চারেক টাকার পাইপ। জলের নল বিকল করার বুদ্ধি হাতিদের কে যোগাচ্ছে, তা অবশ্যি জানা যায় নি। বিরোধীরাও বলছে না যে শাসক দল হাতি পাঠিয়ে এসব করেছে। বললে বরং প্রমাণ হয়ে যাবে যে হাতিদের সংগঠন করার ক্ষেত্রে বিরোধীরা ব্যর্থ। তাই দলমত নির্বিশেষ শ্রমিকরা রাত জাগছেন হাতির সঙ্গে হাতাহাতি করার জন্য। সংক্ষেপে একেই বলা হয় 'চা বাগানে হাতির বাড়া'।

গোপিতা

কোচবিহারের একাধিক গ্রাম থেকে গেরস্তের গোমাতারা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘোরতর অমঙ্গলের প্রতিকার করতে গিয়ে কয়েকজন পাব্লিক ঠিক করেছিল রাস্তায় ষাঁড় ছাড়তে হবে। গোপিতাই পারেন এমন সর্বনাশের যুগে মঙ্গল ডেকে আনতে। এই ভেবে গাড়ি ভাড়া করে তাতে ষন্ড চড়িয়ে পথে ছাড়তে গিয়ে বাধল ঘোর বিপত্তি। এলাকার বাকি পাব্লিকরা গোমাতা রক্ষায় গোপিতার আবির্ভাবকে মোটেই মেনে নিলো না কো! দু-বেলা ষন্ডকে খাওয়াবে কে? তদুপরি ষন্ড যদি রেগে গিয়ে লন্ডভন্ড করে তবে তাকে ঠেকাবে কে? প্রতিবাদে পিছু হটে আরেকটা গ্রামে ষন্ড লঞ্চ করার চেষ্টা করেছিলেন মঙ্গলকামীরা। সেখানে অভ্যর্থনা জানান হলো 'মার মার' ধ্বনি দিয়ে। ফলে নিজেদের মঙ্গলের কথা ভেবে গোপিতাকে সঙ্গে করে চোঁ চম্পট! শেষ গুজবে জানা গেছে যে ষন্ডটিকে নাকি কৈলাসে ফেরৎ পাঠান হয়েছে। পিতারা চিরকালই অবহেলিত গার্জেন। সবাই জানে।

শীত

শোনা যাচ্ছে জল্পেশগ্রাম পুরসভার দুই পারিষদ সমুদ্রবাবু আর ঘরে বাইরে বাবুর সন্ধি হয়ে গেছে! এমনিতে হচ্ছিল না, শেষে মোহনভোগ খাওয়াতে হয়েছে। সত্যি নাকি কত্তা? তবে তো শীতকালটা বড়ো ঠান্ডা যাবে! এই আবহাওয়ায় উত্তেজনা না থাকলে ভালো লাগে? শুনছি সন্ধি এত্ত প্রবল যে গলাগলি করে অট্টালিকা পরিদর্শনে দু-জনকে ভ্রাম্যমান দেখা গেছে গো! কী বিপদ! ওদিকে ম্যারাথন রেস নিয়ে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে সূর্যবাবুর জম্পেশ লেগেছিল! সেটারও কোনও আপডেট নেই। ফেবুতেও শুনেছিলাম কোচরাজ্যে কি জানি একটা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল — ওই সূর্যবাবু আর অর্জুন লাইকের মধ্যে। তারপর? নাঃ! তিন ঘন্টা ফেবু ঘেঁটে আর কিছু মিলল না কো! তবে শুনলাম নাকি নাগ্রা গ্রাম থেকে যিশুবাবুকে তুলে এনে জেলায় সুগন্ধিবাবুর আড়ারে দেওয়া হয়েছে আর নারদবাবু একদিন ছিলেন লাটাগুড়িতে। আম্রশিশু নাকি লাটাতেই ছিলেন দ্যাট ডে! নাহ! এটাও জমবে না! সত্যিই শীত পড়িছে গো বাবু মশাই! এলায় সিগনাল সব জমি গিসে! তায় দিদি আসিসে— ঠান্ডায় ঠান্ডা বাপৈ!

হাটুরে

কুশিয়ারবাড়ি হাট সবে জমেছে। হাট লাগোয়া এক বাড়ির গেরস্ত হঠাৎ শুনলেন, ফর ফর ফর! জল পড়ছে যেন! ঠিক তাই। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে আটকে গেছে ও কে? উঠে

গিয়ে নামতে পারছে না! কী সব্বোনাশ! নামবে কী করে? গোটা পাইপ ভেঙে পড়ে গেলে তো মরে যাবে! শুরু হলো হুলুস্থুলু! ডাক পেয়ে সাইরেন বাজিয়ে দমকল হাজির। বেশ কসরৎ করে ছোকরাকে নামিয়ে আনা হলো। এমন জলজ্যান্ত শো দেখতে পেয়ে পাব্লিক কি আর হাটে থাকে! স-ব এসে ভীড় জমিয়েছিল পাইপ

থেকে ছেলে নামান দেখতে। ফলে হাট লাটে। ঘটনাটা ঘটার পরেও হাট জমতে পারত, কিন্তু ঘটনা নিয়ে এত্ত আলোচনা হলো যে কেউ আর ভাবলোই না বাজার করতে হবে! আরে ভাই, হাট তো আবার বসবে, কিন্তু ছেলে কি আর রোজ রোজ পাইপ বেয়ে উঠে আটকে যাবে?

পুঁটি রে

দুটো পুঁটির জন্য হুটোপুটি কম হয় না মামা! মুসুর ডাল আর পুঁটি ভাজা, যে জন খাবে সেইই তো রাজা! তবে কি না বাজারে রাঘব বোয়ালদের দেখা গেলেও চুনোপুঁটি হয়ে যাচ্ছিল লুপ্তপ্রায়। ঠিকঠাক মাপের পুঁটির দাম শুনে গুটি গুটি পায়ে ফিরে চলে যেতেন বাজারুগণ। এবার গম্মেন্ট তাই আসরে নেমেছে। দিনহাটায় চুনোপুঁটি উৎসব উপলক্ষ্যে পুঁটির ছানা ছাড়া হচ্ছে জলে। ধৈর্য ধরে তাদের বড়ো হওয়ার সুযোগ দিলেই দুটো পুঁটির জন্য হুটোপুটি করতে হবে না আর। মুঠিতে পুঁটি নিয়ে রুটি দিয়েও খাওয়া যাবে। বাজারে গিয়ে পুঁটিমূল্য শুনে ইসিজি করতে ছুটতে হবে না। শুধু কি পুঁটি? কুচো বংশের যাবতীয় ক্ষীণ হয়ে আসা মীণগণ এবার সুখে সরোবরে জলক্রিয়া করবে ডুয়ার্সে। তাহলে কি রাঘব বোয়ালদের দিন শেষ? না কত্তা! তেনারও থাকবেন। তবে ধরা হবে কম। রাঘব বোয়ালদের বেশি ধরপাকড় করা কি দেশের পক্ষে ভালো রে? তাদের খুঁটির জোর যে পুঁটির জোরের চাইতে বেশি!

দিনহাটার খবর

মনে করুন রাম আগুন পোহাতে গিয়ে ধরিয়ে ফেলল। ফোন করল দমকলে। দুটো ল্যান্ড নাম্বার। দুটোই অচল। তখন সে ফোন করবে কোনও কর্মীর নাম্বারে। তিনি তখন অফ ডিউটি। টয়লেটে গেছেন। সেখান থেকে আরেক কর্মীকে। সিগন্যাল অস্পষ্ট। —আরে খাড়ান কত্তা! ভূতে ধরসে নাকি? দমকলের ফোন খারাপ তা সারায় না ক্যান? —না যে ক্যান, সেটাই তো প্রশ্ন রে বাবু! আগুন লাগলে মনে হয় হোয়াটস অ্যাপ করতে হবে বুঝলি? আগুনের ছবি পাঠালে ভালো হয়। তবে খুচরোতে যখন এসব নিয়ে খুচখাচ করছি, তখন মনে হয় ফোন ঠিক হয়ে যাবে। নইলে দিনহাটা দমকলকে একটা ফেবু একাউন্ট খুলতে হবে। আগুন লাগলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ওয়ালে একটা পোস্ট মারবি। ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ফোন নেই? না রে! ও রকম মনে হয়।

টুক্রাণু

হাড়হিম শীতে ডুয়ার্সে স্বমেজাজে চোরেরা। শীতের অপমান সইতে না পেরে সব্জিরা সুইসাইড করছে ডুয়ার্সে। আনন্দ সংবাদঃ আরো একজোড়া চা বাগান লাটে ওঠার মুখে। প্রচুর অবৈধ সুরা বাজেয়াপ্ত— মাতালদের মতে 'অমানবিক'। ঠান্ডায় আগুন পোহান নিয়ে ধূপগুড়িতে ধুন্ধুমার। বক্সায় পাখি উৎসবে

মাফলার পরে আসার সিদ্ধান্ত পাখিদের। বাঘের জন্য হরিণ এলো ডুয়ার্সের কোনও কোনও অরণ্যে। ন্যাওড়ার জঙ্গলে আবার রয়াল বেঙ্গলের প্রমাণ ক্যামেরায়। পাহাড়ে গুরুংকে খোঁজার জন্য ড্রোন এসেছে, ব্যাটারি আসে নি। সেরার দৌড়ে ধূপগুড়ি থানা দেশে ফোর্থ এবং সেই আনন্দে সেখানকার প্রেস ক্লাবে চুরি। ধরা পড়ার পর কলার তুলে বনে ফিরল একটা চিতা— আরো একটা তুলবে। বাইসন মেরে পিকনিক কালচিনিতে। চোর ধরতে হাতি পেলে কী করতে হবে তা নিয়ে কোচিং পুলিশদের।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
শশাঙ্ক ৯০৪৬৬৯৫৬২৯
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি) ৮৬০৯০৮৮৯০৭

কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

বন্ধ চা-বাগানগুলি লিজ দেওয়া হোক স্বনির্ভর গোষ্ঠি মডেলে

লোগো তৈরি হোক ডুয়ার্স ব্র্যান্ডের

পর্যটন সাধ্যের মধ্যে হতে পারে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের হাত ধরে

'ডুয়ার্সের চা ও পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যত নতুন বছরে কী হতে পারে?' এই প্রশ্নকে সামনে রেখে বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চা চক্রের আসরে বিগত বছরের শেষ লগ্নে জমে উঠেছিল চা চক্রের আসর। ২০১৭-র ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির 'আড্ডাঘর'-এ । আয়োজক 'এখন ডুয়ার্স'। মূল বক্তা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী, চা শিল্পপতি কিষন কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী ও সবশেষে জনপ্রিয় নেতা দেবপ্রসাদ রায় আলোচনা থেকে উঠে এল বিভিন্ন প্রস্তাব।

. নিছক আড্ডার মেজাজেই বিশিষ্ট চা শিল্পপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী ডুয়ার্সের চায়ের লোগো তৈরি করার দাবি জানালেন টি বোর্ডের কাছে। তাঁর বক্তব্য, ডুয়ার্সের অনেক চা-করই উন্নতমানের চা প্রস্তুত করেন। অথচ ডুয়ার্সের চায়ের লোগো না থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে সময়ে সময়ে দাম পায় না ডুয়ার্সের চা। অথচ দার্জিলিঙের চায়ের নিজস্ব লোগো বা ব্র্যান্ড নেম আছে। আসামের আছে। ডুয়ার্সের চায়ের লোগো থাকবে না কেন? তাঁর মতে লোগো থাকলে চায়ের বাজারে ডুয়ার্সের চা আরও জনপ্রিয় হবে। আক্ষেপ করে এই বিশিষ্ট চা শিল্পপতি জানান, আসামে একটাই মাত্র ইউনিয়ন চা-বাগানগুলিতে। বাগানে যে কোনও সমস্যা হলে মালিক বা ম্যানেজারদের সঙ্গে ইউনিয়ন বসে যায়। আলাপ-আলোচনা হয়, মত বিনিময়ের ফলে সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের চায়ের জগতে ছোট, ইউনিয়নের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এক ইউনিয়নের সমস্যা মেটাতে না মেটাতেই আর এক ইউনিয়ন আসছে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে। ফলে নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তাই প্রধানত এই একটি কারণেই আসাম আজ বিশ্ববাজারে গুণগতমানের চা উৎপাদন করে 'আসাম টি' ব্র্যান্ড নেমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে, আর পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প সম্মিলিত দাবিদাওয়ার চাপে ধুঁকছে। তাঁর বক্তব্য, পর্যাপ্ত পাতা আনতে না পারলে মালিক মজুরি দেবে কোথা থেকে? ডুয়ার্সে প্লাকিং-এর চিরাচরিত ধারাকে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী কল্যাণী। ভুটানের ডলোমাইট এবং সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সৌজন্যে প্রায় ৩০-৪০টি চা-বাগানের ভয়ংকর অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা তুলে ধরেন চা-শিল্পপতি তাঁর বক্তব্যে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে কৃষিবিজ্ঞানীদের নিয়ে এসে বাগানগুলির মাটি পরীক্ষা করে কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং বিকল্প কী উপায় আছে সেদিকে টি বোর্ডকে নজর দিতে অনুরোধ করেন। কেনিয়ার চা-শিল্পের সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভারতীয় চায়ের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, কেনিয়ায় প্লাকিং-এর গুণগত মান একদিনে তৈরি হয়নি। লম্বা লম্বা পাতা তুললে চা হয় না। ভাল কোয়ালিটি চায়ের জন্য মাঝারি সাইজের পাতা তুলতে হবে। তিনি বলেন সরকার এখনও শিল্পের মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ঘোষণা করেনি। চায়ের ন্যুনতম দাম সরকার ঘোষণা করলে মালিকপক্ষও ন্যুনতম মজুরি নিয়ে ভাবতে পারবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন চায়ের গুণগত মান ভাল হবে না, চায়ের ন্যুনতম দাম সরকার ঠিক করে দেবে না, আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের দাম ভাল পাওয়া যাবে না, অথচ গ্র্যাচুইটি, পিএফ, ন্যুনতম মজুরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেশন, পানীয় জল, ক্রেশ, কোয়ার্টার, বিদ্যুৎ সবকিছু দিতে হবে মালিককে? নতুন বছরে এই অব্যবস্থার উত্তরণ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট চা শিল্পপতি।

দেবপ্রসাদ রায় ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানগুলিকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট স্তরে লিজ দিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে চা চাষিদের চা উৎপাদন বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর

বক্তব্য রাখছেন দেবপ্রসাদ রায়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন কিষাণ কল্যাণী, মিহির গোস্বামী, প্রশান্তনাথ চৌধুরী

বক্তব্য রাখছেন মিহির গোস্বামী

মতে, বড় ব্যবসায়ীরা যখন বাগান চালাতে পারছেই না, তখন সরকার টি বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে একটা পরীক্ষানিরীক্ষা করতেই পারে। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের ধারণাকে নিয়ে ক্ষুদ্র চাষিরা যদি সর্বভারতীয় স্তরে নিজেদের একটা স্থান করে নিতে পারে তাহলে এই ধরনের প্রকল্প হতেই পারে।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকটিকে নিয়ে বলতে উঠে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী প্রথমেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বহুমুখী কর্মধারার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের মাসিক আয় ছিল ৫.৫-৬ কোটি টাকা। তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠার পর মিহিরবাবুর পূর্ববর্তী আরও তিনজন চেয়ারম্যানের আমলে আয় বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৫ কোটি টাকা। তাঁর আমলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংস্থার কর্মীদের সম্মিলিত চেষ্টায় মাসিক ১৩.৫ কোটি টাকার কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা বাড়াবার সুযোগ হয়েছে বলে জানান মিহিরবাবু। তিনি আরও বলেন, পরিবহণই ডুয়ার্সের পর্যটন প্রসারের ভিত্তি। 'সবুজের হাতছানি' প্রকল্পের ধাঁচে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক 'রিলিজিয়াস টুরিজম'-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন মিহিরবাবু। জল্পেশ-জটিলেশ্বর-বাণেশ্বর-কোচবিহার-দিনহাটার ধর্মীয় পর্যটনের সঙ্গে বন ও পাহাড়কে যুক্ত করে কোনও পর্যটন প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কি না সে বিষয়ে লিখিত আকারে প্রজেক্ট পাঠাতেও সবাইকে অনুরোধ করেন তিনি। প্রস্তাব বোর্ড মিটিংয়ে গৃহীত হলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন তা নিয়ে পরীক্ষনিরীক্ষা করবে বলে আশ্বাস দেন মিহিরবাবু। তিনি আরও বলেন, ৮৫ শতাংশ গ্রামীণ অঞ্চল পরিক্রমা করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। ২০১৮ সালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণকে আরও গতিশীল করতে চান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান, তাঁর মতে পরিবহণ পরিসেবা বাড়লে পর্যটনের প্রসার স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে, কারণ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস পর্যটকের পরিবহণের খরচ

> চায়ের ন্যূনতম দাম সরকার ঘোষণা করলে মালিকপক্ষও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ভাবতে পারবে। আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের দাম ভাল পাওয়া যাবে না, অথচ গ্র্যাচুইটি, পিএফ, ন্যূনতম মজুরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেশন, পানীয় জল, ক্রেশ, কোয়ার্টার, বিদ্যুৎ সবকিছু দিতে হবে মালিককে?

কমিয়ে দিতে অনেকটাই।

ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী চা-শিল্প ও পর্যটনের মেলবন্ধন করতে গিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এককালে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কথা কেউ গুরুত্ব দিত না, এখন জলপাইগুড়ি জেলায় ৫২ শতাংশ ক্ষুদ্র চা-চাষিদের চা নিলাম বাজারের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও যাচ্ছে। চায়ের ইতিহাস ১৫০ বছরেরও বেশি পুরানো। জলপাইগুড়ি যখন আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে ছিল তখন ছিল ২৬৩টি বাগান। জেলা ভাগ হওয়াতে বাগানগুলিও দুই জেলায় পড়ে গেল। বৃহদায়তন বাগানগুলির উৎপাদন এবং বন্টনে সমস্যা একটা ছিলই এবং ২০১৭ সালেও নানাবিধ সমস্যার জালে জর্জরিত ছিল চা-সমাজ। কিন্তু ক্ষুদ্র চা-চাষিরা 'সেল্ফ হেল্প' গ্রুপের মতো করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং তৃণমূল স্তরে ঐক্যের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কের সহায়তায় রাশিয়াতেও চা পাঠিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলাতে সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলি নিজেরা তিনটে ফ্যাক্টরি করেছে, উন্নত কোয়ালিটির চা উৎপাদন ও বিলিবন্টন হচ্ছে। বিজয়গোপালবাবুর মতে টাটা বা হিন্দুস্তান লিভার ডুয়ার্সকে ব্র্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করেনি। ডুয়ার্সের চায়ের গুণগত মান বাড়াতে পারলে এর ভবিষ্যত ভাল বলেই মত বিজয়গোপালবাবুর। নতুন বছরে সরকার, টি বোর্ড নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা বিজয়গোপালবাবুর।

পর্যটন নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর অভিমত, মাইসোর প্যালেসতুল্য কোচবিহার রাজবাড়িকে নিয়ে সুসংহত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাটসহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন গত পাঁচ বছরে যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছে। লাটাগুড়িতে বটলিফের মালিক রিসর্ট করেছেন। হোম স্টে টুরিজমের বিকাশে সরকারকে আরও ব্যপকভাবে নজর দেওয়ার কথা বলেন বিজয়বাবু। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র হিসাবে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামীকে তিনি পর্যটনকেন্দ্রিক পরিবহণের নতুন নতুন প্যাকেজ কম খরচে চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজবাড়ি, ধর্মস্থান, বন, পাহাড়, পাখি বিষয়ক বৈচিত্র্যময় পর্যটন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুবিধ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান ক্ষুদ্র চা-শিল্পের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

দেবপ্রসাদ রায় ইকো পর্যটন প্রসারে তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলেন। বিধায়ক থাকাকালীন তিনি তৎকালীন পর্যটন মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায়কে দিয়ে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার জন্য ৪৬ কোটি টাকার মেগা টুরিজম প্রকল্পের অর্থ সাহায্য নিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। তার মধ্যে ২৩ কোটি এসেও যায়। কিন্তু গড়িমসি করে 'ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট' না পাঠানোর ফলে বাকি ২৩ কোটি টাকা আর পাওয়া যায়নি বলে আক্ষেপ করেন বর্ষীয়াণ এই রাজনীতিবিদ। দেবপ্রসাদবাবুর মতে, উত্তরবঙ্গে ইকো টুরিজম এবং হোম স্টে টুরিজমের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান হতে পারে। পরিবেশ সুরক্ষা জনিত কারণে বক্সায় টুরিজম বন্ধ থাকার ফলে এই আইনি জটিলতার কারণে কর্মসংস্থান ও রুটিরুজি হারানো বনবস্তি তথা সাধারণ মানুষের এই কষ্ট ২০১৮ সালে নিশ্চয়ই দূর হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন

পৌষে পার্বণমুখর মালবাজার

গুড়ের রসের মতো মিষ্টি শীত, যার অপেক্ষায় বছরভর থাকে ডুয়ার্সের মানুষ, মালবাজারও তার বাইরে নয়। তবে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে তো ফারাক থেকেই যায়, অংক কখনও মেলে কখনও মেলে না। দীর্ঘ বারো বছর অর্থাৎ একযুগ ধরে মালবাজারের শীতগুলিতে সে অংক মেলেনি, কিন্তু এবার সব কিছু খাপে খাপ। এবার শীতে খেজুর গুড়ের হাঁড়ি যেন মালবাজারের দিকেই উপুড় হয়েছে। যেমন চোদ্দ বছর পর এবছর মালবাজারে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর শহরের আদর্শ বিদ্যাভবনের খেলার মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। খেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মাণিক ভট্টাচার্য। মালবাজারে খেলার শেষ দিনে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সচিব তথা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মৃন্ময় ঘোষ খেলার পতাকা ময়নাগুড়ি এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকার হাতে তুলে দেন, অর্থাৎ আগামী বছর জেলা ক্রীড়ার দায়িত্ব পাচ্ছে ময়নাগুড়ি।

ডিসেম্বরের প্রথম থেকে যে উৎসবের শুরু হল তা মাসের মাঝামাঝিতে এসে যেন বাড়তি গতি পেয়ে গেল। মালবাজারের নাট্যদল অ্যাক্টোওয়ালার উদ্যোগে ১৬ থেকে ১৮ ডিসেম্বর তিনদিনের নাট্য উৎসব আয়োজিত হল। উৎসবের উদ্বোধন করেন ডুয়ার্সের বর্ষীয়ান নাট্য ব্যক্তিত্ব অমলেন্দু বিশ্বাস। প্রতিদিন তিনটি করে একাংক নাটক মঞ্চস্থ হয়। শহরের সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসব আয়োজিত হয়। উল্লেখ্য এবারের উৎসব সপ্তম বছরে পড়ল। ভাল নাটক দেখার প্রবণতা মালবাজারের রয়েছে বলেই নাট্য উৎসবকে ঘিরে দর্শক সমাগমও ভালরকমের ছিল বলেই জানান প্রধান কর্মকর্তা সুধাংশু বিশ্বাস।

এরপর শীত যত গভীর হয়েছে ততই গাঢ় হয়েছে উৎসবের মেজাজ। বারো বছর পর বড়দিনের আনন্দ শতগুণে বাড়িয়ে তুলে শহরে এবার জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা। আদর্শ বিদ্যাভবনের ময়দানে ৬০টি স্টল নিয়ে তৈরি বইমেলা ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। এ যেন স্রেফ জেলা বইমেলা নয়, আয়োজনে উদ্দীপনায় জেলার বইমেলা বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। মেলার উদ্বোধক 'ঘরের ছেলে' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বাবার রেলের চাকরির সুবাদে মালবাজারে শৈশবের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছিলেন তিনি। এরপর আর আসা হয়নি। দীর্ঘ ৭০ বছর বাদে ফিরে স্পষ্টতই স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন তিনি। ঘুরে দেখেন জরাজীর্ণ শৈশবের রেলকোয়ার্টারটিকেও। বইমেলার জৌলুশ বাড়িয়ে দিতে অল্প সময়ের সিনেমা উৎসবও হয়। মেলার একপ্রান্তে পৃথক অডিটোরিয়ামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং সংগীতজ্ঞ কল্যাণ সেন বরাট। মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পাওয়া জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা অভ্রদীপ ঘটকের সিনেমা অভ্রদীপের উপস্থিতিতেই দেখানো হয়। আলোচনাচক্র, কবিসম্মেলন, বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সব মিলিয়ে বইমেলা থেকেই বর্ষবরণের মৌতাত ছড়িয়ে পড়ে। বিকিকিনি, সার্বিক পরিকাঠামো সবেতেই খুশি হয়ে মেলা শেষ করেন প্রকাশকেরা।

এখানেই শেষ নয়, ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি মালবাজারে অনুষ্ঠিত হল বিবেকানন্দ চ্যাম্পিয়নশিপ নক আউট নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবার এই খেলা জুড়ে তারকার ছড়াছড়ি। বাংলা ও ভারত দাপানো প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি কলকাতা প্রবীণ একাদশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অতীত দিনের খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। শুক্রবার এই প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমেই এবারের টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হবে। সমরেশ চৌধুরী, বিকাশ পাঁজি, অলোক দাস, তুষার রক্ষিত, ষষ্ঠী দুলে-দের মতো ফুটবলাররা কলকাতা একাদশের হয়ে খেললেন। মোট আট দলের এই টুর্নামেন্টে কলকাতা কাস্টমস, রেলওয়ে এফ সি, সিঙ্গুর ফুটবল ক্লাব, শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, বাংলাদেশ ঢাকার সেফ স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড, অসম বনজর এফসি-র মতো দলগুলির সঙ্গে খেললেন বিগত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন দল ওদলাবাড়ির নেতাজী সুভাষ ও অ্যাথলেটিক ক্লাব আর এবারেই প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে খেলতে নামল মালবাজারের সৎকার সমিতি। উল্লেখ্য প্রতিদিন পনের হাজারের বেশি দর্শকের উপস্থিতি থাকা এই টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যেই আইএফএ স্বীকৃতিও পেয়েছে।

সব্যসাচী ঘোষ

জলপাইগুড়ি বইমেলা আসছে

শিব্রাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, মেলা বই জড়ো হয় যেখানে, সেটাই বইমেলা। এই মজাদার সংজ্ঞার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই সত্য— বইমেলায় নানান বইয়ের ঘটে সমাহার। শুধু আকারে যা প্রকারেই নয়, কত রকম ভাষা, বিষয়বস্তু, মুদ্রণ পারিপাট্য, বাঁধাইয়ের সৌকর্য, কারিগরি নৈপুণ্য! রংবাহারি বস্ত্রমেলা বা বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে তৈরি শিল্পমেলার সঙ্গে বইমেলার একটা আপাত-মিল লক্ষ্য করে কেউ ভাবতে পারেন, এ তো সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। সেই গুচ্ছের লোক, দোকানের পর দোকান, বহুবর্ণী প্রচ্ছদের বর্ণিল ইশারা। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, কাগজের ঝোলা, কাপড়ের থলে। সেই ডিসকাউন্ট কিংবা অর্ধেক দামে জিনিসের মতো বিকোবার প্রলোভন। বই আর বস্ত্র তাহলে কোথায় আলাদা? পুস্তক আর পত্রপুট কি কোথাও ভিন্ন?

মানুষের কাছে বই এখনও, প্রেশাস লাইফ-ব্লাড। ফ্রেন্ড ফরএভার। মানবসভ্যতার উত্তরণ লগ্ন থেকে হৃদয় ও মননের শ্রেষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সঙ্গী হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে বই। বইয়ের এই বন্ধুত্বকে সম্মান জানাতেই বইমেলায় উপচে পড়ে ভিড়। নিজের বন্ধুকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজে নেবার কষ্ট পরিণত হয় আনন্দে। মেলায় আসেন নানা শ্রেণির পাঠক ও পাঠিকা। দেখা হয়ে যায় পাঠকের সঙ্গে লেখকের। লেখক-পাঠক মিলিয়ে যে সম্পর্ক তার সেতুটিই হচ্ছে বই।

সময়ের অভাবে আমাদের জীবন থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে বই পড়ার সাধ-স্বপ্ন। তবু বই পড়ার শ্রম স্বীকার করতে মানুষ এখনও পিছ-পা নয়। কষ্টেসৃষ্টে একটু সময় বাঁচিয়ে তাই প্রিয় বই, ভাল বই চিরকালের বইয়ের সঙ্গলাভ করতে বইমেলায় ছুটে আসবেন পাঠক। কেননা আমাদের জীবনে বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। শুধু বইকে কেন্দ্র করে বিশ্ব জুড়ে সারা বছর যত বইমেলা হয়, তা দেখে বোঝা যায় যুগ যুগ ধরে মানুষের ভেতর অনুভবী পাঠকটি দিব্যি বেঁচে আছে।

আনন্দের খবর, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন থেকে আয়োজিত হচ্ছে জলপাইগুড়ি বইমেলা। মেলা কমিটির আহ্বায়ক গৌতম গুহ রায়ের কাছ থেকে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা থেকেও আসছেন বিভিন্ন নামী-অনামী প্রকাশকেরা। আশা করা যাচ্ছে, সত্তরের বেশি স্টল হাজির থাকছে সেই মেলায়। পাঠক জেনে খুশি হবেন, হরেক রকম বইয়ের পশরা নিয়ে এই বইমেলায় উপস্থিত থাকছে 'এখন ডুয়ার্স'। এর আগে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার বইমেলাতে এখন ডুয়ার্স-এর স্টলে উপচে পড়েছে মানুষ। জলপাইগুড়ি শহরেও সেই ট্র্যাডিশন যে বজায় থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

বর্ষশেষের আড্ডাগান প্রবীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে

৩১শে ডিসেম্বর আড্ডাঘর ক্লাবের সহযোগিতায় আর তবলা শিল্পী প্রবীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে মজলিশি আসর বসিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানান হলো। কয়েক ঘন্টা ধরে ঠুমরি, দাদরা, লহড়া, খেয়াল, গজলের পর আসর থামল রাত ১টায়। বারোটার সময় দু-কলি গেয়ে ২০১৮কে স্বাগত জানিয়ে দিলেন মালদা থেকে হারমোনিয়াম বাজাতে আসা দেবাশিস দাশগুপ্ত। শেষ শিল্পী সুনন্দা চক্রবর্তী গলার কারণে বেশি গাইলেন না। শ্বাশতী কর গাইবার উপযোগী গলায় ছিলেন না, কিন্তু অনুরোধ মেনে একটু গেয়েছিলেন।

সমীরণ শর্মা 'ভূপালি' ধরেছিলেন। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে জমিয়ে দেন। তানকর্তব বেশ হয়েছিল। তারপর 'যোগ' গেয়েছিলেন। শুনছি তিনি নাকি আড্ডাঘরে সারা রাত ধরে মজলিশ বসাবার কথা ভাবছেন। তাই বুঝি? সাধু সাধু!

প্রবীর চক্রবর্তী

তীর্থঙ্কর বসু কয়েকটি ভজন গাইলেন স্বতস্ফূর্ত ভাবে। গজল গেয়ে বাহবা কুড়োলেন চন্দন চক্রবর্তী। তবলা লহড়া একসঙ্গে বাজিয়েছিলেন রুদ্রাজিৎ বোস এবং শুভজিৎ চক্রবর্তী। ঠুংরি গেয়েছিলেন প্রেরণা দে।

তবে মজলিশে সেরা ফর্মে ছিলেন উদ্যোক্তা প্রবীরবাবু। একাধিক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর তবলাবাদন সবাইকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। প্রচুর পরিশ্রম করে শিল্পীদের হাজির করানর দায়িত্ব সামলে পারফর্ম করা সোজা কথা নয়। তদুপরি ক্লাব ঘরটিকে মজলিশের চেহারায় সাজিয়ে সদস্যদের বেশ অবাক করে দিয়েছিলেন। বলতেই হয় সৌরভ মন্ডলের গিটারবাদনের কথা। শিল্পীদের সঙ্গে তিনি চমৎকার তাল মিলিয়ে বাজিয়েছেন। শব্দ প্রক্ষেপন বেশ মিষ্টি ছিল। শোনা যাচ্ছে পরের মজলিশ 'বসন্ত' উপলক্ষ্যে হোলির দিন হতে পারে। শহরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রেমীরা উল্লসিত হবেন। সেদিন তাঁরা অনেকেই এসেছিলেন। উদ্যোক্তাকে সাধুবাদ জানিয়ে গেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শ্রীমতি স্বনির্ভরাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড

আগের দুটো সংখ্যায় মূলত স্বনির্ভর দলের আইনকানুন ও কিছু কিছু সাফল্যের কাহিনি আলোচিত হয়েছে। এই পরিসরে আমরা পর্যালোচনা করে একবার দেখে নিতে চাই বিগত তিন বছরে স্বনির্ভর দলগুলোকে ঋণদানের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলা কতটুকু এগিয়েছে(টেবিল ১)।

গত বছরের তুলনায় এই আর্থিক বছরে দলের লক্ষ্যমাত্রা ২৫৯ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৩৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবছর গড়ে প্রতিটি দল ঋণ পেয়েছে .২৬ লক্ষ টাকা এটা একটা অবাস্তব চ্যালেঞ্জ মনে হতে পারে— তবে কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক এবং স্বনির্ভর দলের সংগঠনগুলো যেভাবে লেগে আছে তাতে করে লক্ষ্যমাত্রা ১০০ শতাংশ অতিক্রম করবেই। এবার কিন্তু সংঘ, উপসংঘ, ব্লক ও ব্যাঙ্ককে দেখতে হবে যে ৩০০ কোটি বা তার বেশি টাকা দলগুলোকে ঋণ দেওয়া হল তার ব্যবহারের দিকটা। ড. গৌর চ্যাটার্জি, লিড ডিস্ট্রিক ম্যানেজার (এল.ডি.এম) বলছিলেন 'বহুক্ষেত্রে দলের সদস্যরা ঋণ নিয়ে টাকাটা সরাসরি স্বামীর হাতে তুলে দেন। হয়ত টাকাটা স্বামী কৃষিতেই ব্যবহার করবেন তবুও মহিলাটির নিজস্ব জীবিকা বা রোজগারের রাস্তা কিন্তু এভাবে তৈরি হয় না'। সমাধানের রাস্তা বাতলাতে গিয়ে বলেছিলেন 'দু'রকমের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রথমে সচেতনা বৃদ্ধির পরবর্তীতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ'।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর অবস্থান

গত ২০১৬-১৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রান্তিক জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার স্বনির্ভর দলগুলিকে ঋণদানের (ব্যাঙ্ক ঋণ) লক্ষ্যমাত্রা এবং তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার চিত্র নিচে দেওয়া হল (টেবিল ২)।

এই টেবিল থেকে বোঝা যায় জলপাইগুড়ি জেলা লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে সহজেই, কিন্তু দলপ্রতি ঋণের পরিমাণ রাজ্যে ১.৪৮ লক্ষ টাকা অথচ জলপাইগুড়িতে ১.২৬ লক্ষ টাকা। আলোচনায় জানা যায় কিছু চা-বাগান এলাকায় ঋণের চাহিদা কম কখনও দল বেশি টাকা ঋণ নিতে চাইছে না। যেহেতু ঋণের টাকা ব্যবহার এবং রোজগারের রাস্তা জানা নেই, সেই কারণেই কি এমন অনীহা? যদি দলগুলিকে অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হয় তবে ঋণের পরিমাণ ও চাহিদা বাড়বে।

যদিও আলিপুরদুয়ার জেলায় দলপ্রতি ঋণের পরিমাণ ১.৬১ লক্ষ টাকা যা কি না রাজ্যের গড় থেকে বেশি, তবুও এত কম সংখ্যক উপভোক্তার কাছে কেন ঋণ পৌঁছাল একবার ভেবে দেখা দরকার। বর্তমানে কোচবিহার জেলা আয়তনে বিপুল— তাছাড়া তারা বেশ উঁচুতেই টার্গেট রেখেছিল। ২০১৬-১৭ সালে দশ হাজারের বেশি দলের কাছে ঋণ পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্বের দাবী রাখে।

টেবিল ১ (অর্থ কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জনের পরিমাণ	
—	দলের সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ	দলের সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
২০১৫-১৬	৪৮০০	৫২.৮০	৩৪৩৫	৪৪.০০
২০১৬-১৭	৬০৪৫	৭৮.০৩	৬৯৮৬	১০৩.৪৬
২০১৭-১৮ নভেম্বরের ২২ পর্যন্ত	১৫৬৭১	৩০৬.০১	১৪৩৭৭	২৪৭.৭৫

দশে মিলে করি কাজ

মালবাজার মহকুমাকে প্রকৃতি ছবির মতো সাজিয়েছে। বিস্তীর্ণ সবুজ চা-বাগান, পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী, বিপুল বনানী, বৈচিত্রপূর্ণ বন্যপ্রাণ, কিছুটা পাহাড়। মাল সংলগ্ন চা-বাগান রাঙামাটি— তার মানুষজন ওই রূপসাগরের বাসিন্দা। যারা চা-বাগানের শ্রমিক তাদের যদি বাগান চালু থাকে তবে রোজগারও নিশ্চিত। চা-বাগানে বহু অশ্রমিক বাস করে, বছরে হয়ত দু'-তিনমাস কাজ পায় বাকি সময় অর্ধাহারে, অনাহারে থাকে। কালেভদ্রে দিনমজুরিতে কিছু রোজগার হয়। এই অশ্রমিক পরিবারের নারীরা কিন্তু অনেক সহজেই পাচারকারীদের নজরে পড়ে— পাচারও হয়ে যায়। ওদের স্বনির্ভর দলের আওতায় এনে তালিম দিয়ে, সচেতন করে দল তৈরি করলে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়।

এমন কিছু নারী ২০০৪ সনে হন্যে হয়ে রোজগার করার চেষ্টা করছিলেন। ওদের সাক্ষাৎ হয় এক স্বনির্ভর দলের নেত্রী পুনম লামার সঙ্গে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। ২০০৪ সনের ১৭ ডিসেম্বর গ্রামের ১২ জন মহিলা তৈরি করেন 'মধুবালা' স্বনির্ভর দল। তারা দল থেকে এবং পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে ছোটখাট ব্যবসা, হাতের কাজ থেকে টুকটাক রোজগার করতেন। দলরে সবাই আপদেবিপদে একে অপরের সাহায্য করতেন। পরবর্তীতে স্টেট ব্যাঙ্কের মালবাজার শাখা থেকে তারা প্রকল্প ঋণ (টার্ম লোন) বাবদ ১,৮০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। তৎকালীন নিয়মে মূলধনের উপর ৯০ হাজার

নকল সৌখিন গয়না তৈরির কাজ চলছে

টাকা সাবসিডি পেয়েছিলেন। ঋণের টাকা তারা নিয়ম মেনে পাঁচ বছরে পরিশোধ করেন।

তাদের প্রত্যেক সদস্য গাভী পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়। গড়ে মাসে দু'হাজার টাকা রোজগার হতে থাকে। কিন্তু কয়েকজনের গরু অসুখে মারা যায়। ব্লকের পশুর ডাক্তার ভালমানুষ ছিলেন— তিনি পশুগুলো বাঁচানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু সবার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। এখনও দলের সাতজন সদস্য গাভী পালন করছেন। গাভীগুলোর বীমা করা ছিল— তারা বীমার অর্থও পেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আর গাভী পালন করেননি।

২০১৩ সালে মাল ব্লকের অভ্যন্তরে ক্যান্টিন চালানোর তারা দায়িত্ব নেন। সুনামের সঙ্গে তারা ক্যান্টিন পরিচালনা করছেন। মোমো, চাওমিন, রুটি বা পরোটা সহযোগে সবজি, টিফিনের চাহিদা আছে। তাছাড়া নানারকম পদের সঙ্গে আমিষ ও নিরামিষ ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ব্লক এবং ব্লক সংলগ্ন অন্যান্য অফিসের যে কোনও অনুষ্ঠানে এই ক্যান্টিন থেকে খাবার সরবরাহ করা হয়।

২০১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা দুর্দশাগ্রস্থ মানাবাড়ি এবং টুনবাড়ি নামে দুটো চা-বাগানে রেশন দোকান চালাচ্ছে। মানাবাড়ি বাগানে দোকানের ঘরভারা দিতে হয় ২০০০ টাকা, কার্ডের সংখ্যা ৪২৪টি। টুনবাড়িতে ঘরভাড়া ৫০০ টাকা, কার্ডের সংখ্যা ৭০টি। দলনেত্রী দেবী ছেত্রী পরিষ্কার বললেন— 'এই দরিদ্র শ্রমিকদের রেশন বন্টন করা স্বনির্ভর দল হিসেবে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখানে আমরা লাভের মুখ দেখি না হয়ত তবুও কাজটা চালিয়ে যেতে চাই। রেশনের দোকান— তা কী করে স্বনির্ভর দলের মহিলারা চালাবে, অনেকের মনেই জিজ্ঞাসা ছিল। দু' একজন হয়ত শত্রুতাও করেছে, তাও আমরা রেশন দোকান চালাচ্ছি।' শ্রীমতি দেবী ছেত্রী গর্বের সঙ্গে জানান— বর্তমানে সদস্যরা গড়ে তিন হাজার টাকা রোজগার করছে। আমাদের লক্ষ্য রোজগার বৃদ্ধি করে যাতে প্রত্যেক সদস্যর হাতে মাসে পাঁচ হাজার টাকা পৌঁছায়। বর্তমানে তাদের সঞ্চয় ৫৬ হাজার টাকা। কিছুদিন আগে সেভিংসের টাকা তুলে সদস্যদের ৪৮ হাজার টাকা ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছিল। ওটা নাকি তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ হাতে ক্যাশ টাকা থাকলে ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করা যায়। কথা প্রসঙ্গে জানান ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁদের লেনদেন ভাল, সম্পর্কও খুব ভাল।

বিভিন্ন দপ্তরকে স্বনির্ভর দল অভিমুখি করা

স্বনির্ভর দলগুলোকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করতে সরকার বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। এই একমুখি বা কনভারজেন্স প্রক্রিয়ায় যুক্ত আছে কৃষি দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, জেলা শিল্প কেন্দ্র, মৎস্য দপ্তর, উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর, পর্যটন দপ্তর, বনদপ্তর, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর ইত্যাদি।

মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল

টেবিল ২ (সন ২০১৬-১৭)

জেলা	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জনের পরিমাণ				গড় দলপ্রতি ঋণ
—	দলের সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ	দলের সংখ্যা	শতকরা	ঋণের পরিমাণ	শতকরা	—
কোচবিহার	১২৫২৬	১৫৬.৫৭	১০০১৪	৮০	১০৯.৩৫	৭০	১.০৯
আলিপুরদুয়ার	২১৭৪	৩০.৩৭	৮৬১	৪০	১৩.৮৬	৪৬	১.৬১
জলপাইগুড়ি	৬০৪৫	৭৮.০৪	৮১৭৩	১৩৫	১০৩.১৬	১৩২	১.২৬
সারা পশ্চিমবঙ্গ	২৫৩৯২৮	৩২০০.৯০	২২৪৮৮৪	৯০	৩৩২৯.৮১	১০২	১.৪৮

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শ্রীমতি রচনা ভগত মহিলাদের হাতের কাজ পরখ করছেন

কিছুদিন আগে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় ধূপগুড়ি ব্লকে চারটি অ্যাকটিভিটি ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে চারটি পৃথক গ্রামপঞ্চায়েতে, যথাক্রমে সাকোয়াঝোড়া-২, শালবাড়ি-২, ঝাড়আলতা-১ এবং গাদনং-২। যেমন শালবাড়ি-২ এর অ্যাকটিভিটি ক্লাস্টারের নাম হয়েছে 'আপনজন অ্যাকটিভিটি ক্লাস্টার'। এলাকার বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের ১৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই ক্লাস্টার। ব্যাঙ্কঋণ এবং সরকারি অনুদানে এলাকায় তৈরি হবে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতির একটি বড় ভাণ্ডার। প্রকল্পের আর্থিক উৎস— সরকারি অনুদান ১০ লক্ষ টাকা, নিজস্ব তহবিল ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ব্যাঙ্ক ঋণ ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মোট লগ্নির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা। কৃষকরা সস্তায় যেসব যন্ত্রগুলো ভাড়া পাবেন এই ভাণ্ডার থেকে সেগুলিও নানা প্রকারের যেমন— ট্রাক্টর, স্প্রেয়ার, ডাস্টার ইত্যাদি। কৃষকের জমি তৈরির খরচের উপর সরকার সাবসিডি দেবে। সুজিত পাল, ডেপুটি ডাইরেক্টার এগ্রিকালচার জলপাইগুড়ি, এই প্রকল্পের সাফল্যের ব্যাপারে গভীরভাবে আশাবাদী। সাধারণত ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের মেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য ৭ থেকে ৯ বছর সময় দিয়ে থাকে। সংঘ নেত্রী শ্রীমতি সন্ধ্যা রায় জানিয়েছেন, তারা অর্থ জোগাড় করে মুড়ি এবং চিড়া তৈরির মেশিন বসাবেন, যেন সারাবছর নিয়মিত একটা রোজগারের ব্যবস্থা হয়। মহিলারাও বসে নেই, জীবিকার জন্য তাঁরা নানা পরিকল্পনা করছেন।

কৃষক সহায়তার স্বনির্ভর দল

দুর্গা সংঘ, ধূপগুড়ি ব্লকের নেত্রী জানালেন বর্তমানে ধানের বাজার মূল্য ১৪৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আনুকুল্যে সংঘ কৃষকদের কাছ থেকে ১৫৩০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে ধান খরিদ করে মিল মালিকদের সরবরাহ করে। ময়লা ইত্যাদির কারণে কুইন্টাল প্রতি ২.৫ কেজি ধান বাদ দেওয়া হয়। সংঘ প্রতি কুইন্টালে ৩১.২৫ টাকা কমিশন পেয়ে থাকে। সংঘটি গত মাসে সাতটি ক্যাম্প করে ১৯৫০ কুইন্টাল ধান সংগ্রহ করেছে। এই জানুয়ারিতে তারা ১০টি ক্যাম্পে ২০০০ কুইন্টাল ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। সমস্ত ব্যাপারটা অনলাইনে সংঘটিত হয়। সরাসরি কৃষকের জমা খাতায় ব্যাঙ্কে ধানের মূল্য জমা হয়। সংঘ আশা করছে এই ব্যবসায় তারা দু'মাসে লক্ষাধিক টাকা লাভ করবে।

স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্বনির্ভর দল

দুর্দশাগ্রস্থ বন্ধ চা-বাগানের অন্ধকার জীবনে আশার আলো স্বনির্ভর দল। ওরা রেশন দোকান পরিচালনা করে, মিড ডে মিল প্রকল্পে স্কুলে রান্না করে, স্বাস্থ্যকর খাবার শিশু ও কিশোরদের সরবরাহ করে। বান্দাপানি চা-বাগান অনেক দিন থেকে বন্ধ। তারা সংগঠিত করেছেন 'বীরপাড়া মহিলা বিকাশ অ্যাকটিভিটি'। অত্যন্ত উন্নতমানের হাত ধোওয়ার তরল সাবান তৈরি করছেন। রেশনের দোকান এবং স্থানীয়ভাবে তা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন তাদের উৎপাদিত তরল সাবান রসায়নাগারের পরীক্ষায় উন্নতমানের সংশাপত্র পেয়েছে। তাদের সাবানের মূল্য প্রতি লিটার ১৮০ টাকা। বাজারে বিক্রিত সেই সাবানের প্রতি লিটারের দাম ৩৭০ টাকা।

মিডডে মিলের খাবার যেসব বিদ্যালয়ে পরিবেশন করা হয়— সেখানে বাচ্চাদের সচেতনতা বাড়াতে এই তরল সাবান সরবরাহ করতে চায়। ব্লকের এস.এইচ.জি সুপারভাইজার তরুণ ও দরদী মানুষ শ্রীমান জয় রঞ্জন দত্ত কথা প্রসঙ্গে বললেন— 'বন্ধ চা-বাগানে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের লড়াই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে'। আমার মনে হয়েছে জেলা প্রশাসন একটু সাহায্য করলে হাত ধোয়ার তরল সাবান সমস্ত বিদ্যালয় যেখানে মিড ডে মিলে খাবার দেওয়া হয় তার ছাত্ররা ব্যবহার করবে এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্য সচেতন হবে। সাবানের পাত্রগুলোর রিফিলিং করলে লিটার প্রতি দাম আরও কম হতে পারে— এটা ভেবে দেখা দরকার।

শিল্প স্থাপনে দলগত তৎপরতা

প্রায় ছয় বছর আগে ফালাকাটা ব্লকের চৌহদ্দির ভেতর স্বনির্ভর দলের ক্লাস্টাররা একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসান। স্থায়ী মূলধরেন সব টাকাটাই অর্থাৎ ৪.২৫ লক্ষ টাকা ডি.আর.ডি.সি. মঞ্জুর করেছিল প্রল্পের মোট ব্যয় ছিল ৭ লক্ষ টাকা। বিধায়ক অনিল অধিকারী ফিতে কেটে প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি তেনজি বর্মা পি.ডি., ডিআরডিসি, ব্লক আধিকাবিকবৃন্দ। পরে ক্লাস্টার ২টি ডিলার নিযুক্ত করে এবং সরবরাহের সুবিধার জন্য একটি মিনি ট্রাক খরিদ করে। প্রকল্পের ব্যাঙ্ক ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তবে কিছুদিন আগে খবর পেয়েছিলাম, পরিচালনা জনিত কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটলে বা পরিচালনার অভাব ঘটলে দলের শক্তি হ্রাস পায় এবং পতন হয়। এ ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকা উচিত। প্রকল্প তৈরিতে জয়রঞ্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল— সে কি একটু সময় দিতে পারবে?

টোটো পাড়ার বড় এলাচ বিপণন

টোটো পাড়ার অবস্থান মাদারিহাট ব্লকের প্রান্তে, দূরে দেখা যায় ভুটান পাহাড়। প্রচুর সুপারি বাগান, নিকটে কমলাবাগান— এলাচ উৎপাদনেও যথেষ্ট নাম হয়েছে। টোটো পাড়া বল্লালগুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতে শতাধিক মহিলা স্বনির্ভর দল আছে। ইতিমধ্যে ব্লকে তৈরি হয়েছে 'মাদারিহাট স্বরোজগার স্পাইসেস অ্যাকটিভিটি ক্লাস্টার'। এরা অরগানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত মশলা বিক্রি করে। কৃষি বাজারে ঘর আছে। সরকার আড়াই লক্ষ টাকা মূলধন দিয়েছে। তারা মূলত টোটোপাড়ার বড় এলাচ, হলুদ এবং গোলমরিচ বিক্রয় করে।

প্রকল্পটির বর্তমানে শৈশবকাল। তবে চাহিদা ও গুণমান বিচার করলে এটা অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্প।

পরিশেষে বলি পরিচালন ব্যবস্থা এবং হিসাব রক্ষণে জোর দিতে হবে। ইতিমধ্যে স্বনির্ভর দলের মহিলারা প্রমাণ করেছেন— সমাজ গড়ার তারাই মূল কারিগর।

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে প্রতিবেদক ঘুরেছেন সরস্বতীপুর, আনন্দপুর, যোগেশচন্দ্র ও নেপুচাপুর চা-বাগান। তুলে এনেছেন সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

গজলডোবাকে চিরে বেড়িয়েছে তিস্তা ক্যানেল। পাশেই গড়ে উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'ভোরের আলো'। কিন্তু শুধু পর্যটনেই নয়, এবার রাগবিতেও নিজের পরিচিতি চাইছে গজলডোবার নতুন প্রজন্ম। গজলডোবার সরস্বতীপুর চা-বাগানের ছোট একটি গ্রামে আমেরিকার জনপ্রিয় খেলা রাগবিতে মজে রয়েছে সরস্বতীপুর চা বাগিচার ছোট একটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা। গুদাম লাইনের মাঠে ও নদীর পারে প্রায় ৫০০ জন কিশোর কিশোরী খেলার পাঠ নিচ্ছেন। আদিবাসী গ্রামটির চারপাশেই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল।

সরস্বতীপুর

সরাসরি চলে এসেছি ওদলাবাড়ি। ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা ভিউ পয়েন্ট ১৫ কিমি। পরিকল্পনা নিলাম একদিকে ক্ষেত্রসমীক্ষাও করব, অন্যদিকে টুরিজম অর্থাৎ পর্যটন শিল্পের বিকাশের গতিপ্রকৃতিও তুলে ধরা যাবে। অতএব চরৈবেতি। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হনুমান মন্দির অতিক্রম করে ক্যানাল রোডের রাস্তা ধরে সোজা গজলডোবা ভিউ পয়েন্ট। একটু জলযোগ সেরে আমরা যাব সরস্বতীপুর চা-বাগান। জলপাইগুড়ির প্রতিষ্ঠিত চা ব্যবসায়ী কিষাণ কল্যাণীর বাগান সরস্বতীপুর। অন্যান্য বাগানের তুলনায় সরস্বতীপুর চা-বাগানে শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা বেশ ভালই। বাগানের শ্রমিক হাসপাতালটিও উন্নতমানের। বাগানে ক্রেশের মান আরও ভাল হওয়া উচিত এবং সুযোগসুবিধাও বাড়ানো উচিত মালিকপক্ষের। কারখানাটিও উন্নতমানের। শ্রমিক নেতা সুভাষ করোয়া ইতিপূর্বে বাগানের আধিকারিকদের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আবাসনের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুকে। বছরের পর বছর শ্রমিকদের থাকার ঘরগুলি মেরামত হয় না বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের মতে, প্রতিবছর অন্তত দশটা করে ঘর পাকা করে দিলেই সমস্যা ধীরে ধীরে মিটে যায়। বাঁশ, দরমা দিয়ে তৈরি অনেকগুলি ঘরের জরাজীর্ণ চেহারা নিজের চোখেও দেখে এলাম। পাশের জঙ্গল থেকে হাতি বের হয়ে এসেও মাঝে মাঝে শ্রমিক বস্তিতে হামলা করে। দীর্ঘদিন ধরে বাগানের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা তৈরিতে বনদপ্তর বাধা দিচ্ছিল। রাস্তা তৈরি করতে না দেওয়াতে বাগান থেকে স্কুল বা অন্য জায়গায় যেতে শ্রমিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হত। শ্রমিকদের এই অভিযোগও মন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল। বাগিচা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ সবসময়েই উদ্যোগী। বাগানের পাশের রাস্তা তৈরি নিয়ে বনদপ্তরকে বারে বারে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে বনদপ্তর, বাগান কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠন মিলে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান হয়। শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুও সেই সময়ে উষ্মাপ্রকাশ করে বলেছিলেন চা-বাগানের মালিকদের যা যা করণীয় অনেকক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ তা করেন না। সরস্বতীপুর বাগানে আসার আগে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী জেলাশাসকের দফতরে বিভিন্ন বাগানে শ্রমিকদের আবাসন, পানীয় জল, রেশন ইত্যাদি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। চা-শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ পরিশোধ করা নিয়েও রাজ্য সরকার অনড় বলে জানিয়েছিলেন শ্রমমন্ত্রী। বকেয়া পিএফ-এর টাকা উদ্ধারে রাজ্য সরকারের কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তাও দিয়েছিলেন শ্রমমন্ত্রী। ন্যুনতম মজুরি নিয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু হায়! জয়েন্ট ফোরামের জিয়াউল আলমের পরিভাষায় 'শূন্য কুম্ভ বাজে বেশি'।

রাগবি খেলার জাতীয় স্তরের নির্বাচনী শিবিরে সুযোগ পাওয়া চন্দ্রা ও স্বপ্না

তবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে এসে সরস্বতীপুর বাগানে আমি মজে গেলাম রাগবিতে। কারণ আমার বিদ্যালয় ধাপগঞ্জ গভঃ স্পনসর্ড আশ্রম টাইপ হাইস্কুলে আলিম ওঁরাও জাতীয় স্তরের রাগবি প্লেয়ার। অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত দীপেশ ওঁরাও এবং মনোজ ওঁরাওরা আমাদের বিদ্যালয়ের মাঠে রীতিমত রাগবি অনুশীলন করে। তাই আমার সর্বশেষ কৌতূহল ছিলই যে কীভাবে এবং কার সহযোগিতায় রাগবি অনুশীলন করে ওরা? ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে উঠে এল ভিন্নধর্মী আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে এক বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্প। এ গল্প নয়, এ সত্যি ঘটনা। চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারের একেবারে সদ্য হাঁটতে শেখা মেয়েটির হাতেও রাগবি বল। চার বছরের দয়ালু ওঁরাও থেকে ত্রিশ পেরনো যুবক দীপু ওঁরাও সকলেরই প্রিয় খেলা রাগবি। গত দুই আড়াই বছর ধরেই রাগবিতে মজে রয়েছে ডুয়ার্সের সরস্বতীপুর চা-বাগান। বাগানের মেয়েরাই পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড় হিসাবে জাতীয় স্তরে সাফল্য পেয়েছে। তাদের সকলেই গজলডোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। রাগবি খেলায় উৎসাহ যে বাড়ছে তা জানাল সরস্বতীপুর চা-বাগানের বাসিন্দা গজলডোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী কৌশল্যা ওঁরাও, সহদেব ওঁরাওরা। সরস্বতীপুর চা-বাগানের রাগবির ভক্ত কিশোরকিশোরী এবং তরুণ তরুণীদের রাগবি খেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজ্য রাগবি দলের কোচ রোশন শাসা, যিনি সরস্বতীপুর গ্রামেই থাকেন। ছয় বছর বয়সে বাড়ি থেকে

> চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারের একেবারে সদ্য হাঁটতে শেখা মেয়েটির হাতেও রাগবি বল। চার বছরের দয়ালু ওঁরাও থেকে ত্রিশ পেরনো যুবক দীপু ওঁরাও সকলেরই প্রিয় খেলা রাগবি। গত দুই আড়াই বছর ধরেই রাগবিতে মজে রয়েছে ডুয়ার্সের সরস্বতীপুর চা-বাগান। বাগানের মেয়েরাই পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড় হিসাবে জাতীয় স্তরে সাফল্য পেয়েছে।

পালিয়ে কলকাতায় চলে যান রোশন। চার্চের এক পাদরি তাকে উদ্ধার করে অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর রাগবি খেলার উৎসাহ দেখে রোশনকে ফ্রান্সে পাঠান ফাদার। সেখান থেকে রাগবি খেলার তালিম নিয়ে দেশে ফেরেন রোশন। এরপর উড়িষ্যার এক জনপ্রিয় আদিবাসী বিদ্যালয়ে কোচের চাকরি পান রোশন। সরস্বতীপুর চা-বাগানের পার্শ্ববর্তী চার্চের এক পাদরি দুটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রাগবি খেলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এ খবর পেয়ে চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসেন রোশন শাসা। এরপর থেকেই এখানকার তরুণ তরুণীদের প্রশিক্ষিত করছেন তিনি। তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী খেলতে গিয়েছে বিদেশে, জিতে এনেছে পুরস্কার। রোশন শাসার মতে সরকার সাহায্য করলে এই খেলা আরও শীর্ষে পৌঁছবে।

সরস্বতীপুর চা-বাগন অধ্যুষিত গ্রামের গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা চাষবাস এবং মাছ শিকার। একটা অংশ চা-শ্রমিক। চা-বাগানের মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে আসা স্বপ্না ওঁরাও, মিনুকা কোরোয়া, সন্ধ্যা রাইদের মতো মেয়েরা আজ শুধু জেলা নয়, বাংলারও গর্ব। রাগবির মতো বিদেশি খেলায় তারা একটার পর একটা সাফল্য লাভ করেছে। বাগিচার রাগবি দলের স্বপ্না ওঁরাওয়ের মতো পাঁচ জন রাগবি খেলোয়াড় চেন্নাইতে জাতীয় দলের নির্বাচনী ক্যাম্পেও নির্বাচিত হয়েছে। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের গজলডোবার সরস্বতীপুর চা-বাগানের এই রাগবি দলের মেয়েরা এখন সংবাদ শিরোনামে।

উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের অভুক্ত শ্রমিকের একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা সরস্বতীপুর চা-বাগানের স্বপ্না, চন্দাদের সাফল্য এনে দিতে আরও বেশি করে জেদি করে তুলেছিল। দু'বছর আগে ওড়িশায় জাতীয় পর্যায়ের রাগবি প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বাংলা রাগবি দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিল সরস্বতীপুরের মেয়েরাই। কলকাতার সল্টলেকের সাই ক্যাম্পাসের ময়দানে গত বছর বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নেতাজী সুভাষ পঞ্চম স্টেট গেমসে কলকাতা জংলি ক্রাউডস রাগবি দলকে ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সরস্বতীপুরের রাগবি দলটি। অত্যন্ত অভাবের মধ্যেই চা-বাগিচার এই মেয়েরা রাগবির প্রশিক্ষণ নিচ্ছে রোশনের কাছে। টিউশনের টাকা দেবার ক্ষমতা নেই এই মেয়েদের। রাজ্য রাগবি দলে যে বারো জন খেলোয়াড় রয়েছে তারা সকলেই সরস্বতীপুর চা-বাগানের। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের মধ্যেই মেয়েদের প্রশিক্ষণ করাতে হয়। মাত্র দু' বছরের প্রশিক্ষণেই এরা এত বড় সাফল্য পেয়েছে, এদের সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন আছে। বাগানের মেয়ে রাগবি দলের ম্যানেজার কৃপা ওঁরাওয়ের সঙ্গে যখন কথা বলেছিলাম তখন কৃপার মা অসুস্থ। বাবার সামান্য রোজগারে মায়ের চিকিৎসা প্রায় হয় না বললেই চলে। খেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন জাতীয় খাবার প্রয়োজন থাকলেও টাকা না থাকায় সেগুলি জোটে না। দলের ক্যাপ্টেন চন্দা ওঁরাও এর কাছ থেকে জানা গেল প্রশিক্ষণ সেরে বাগানে ফেরার সময় বুনো হাতির সামনে পড়ে কতবার যে তারা প্রাণে বেঁচেছে তার হিসাব নেই। মিনুখা করোয়ার বক্তব্য, 'বন্ধ চা-বাগানে না খেতে পেয়ে শ্রমিক মারা যাচ্ছে। আমরা চালু চা-বাগানে থেকে বাংলা তথা দেশের জন্য

সরস্বতীপুর চা-বাগানে চলছে রাগবি খেলার অনুশীলন

যদি একবেলা ঠিকমতো না খেয়েও যদি কিছু করে দেখাতে পারি তাহলে জীবনে কী করলাম?

স্বপ্নার বাবা মনু ওঁরাও এবং চন্দ্রার বাবা সুরেন ওঁরাও সরস্বতীপুর চা-বাগানে মাসিক ৪৮০০ টাকার শ্রমিকের চাকরি করেন। তাঁদের এই সামান্য আয় দিয়েই সংসার চালাতে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। মেয়েদের খেলার জন্য যে ধরনের ভাল খাবার প্রয়োজন তা তাঁরা দিতে পারেন না। অথচ সরস্বতীপুর চা-বাগানের স্বপ্না এবং চন্দ্রা জাতীয় রাগবি দলে নির্বাচিত হয়ে এখন দেশের জন্য খেলছে আন্তর্জাতিক স্তরেও। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার ময়দান থেকেই সরস্বতীপুর চা-বাগানের পাঁচ জনের চেন্নাইতে জাতীয় স্তরের নির্বাচনী শিবিরে অংশ নেবার সুযোগ হয়, যাদের মধ্যে স্বপ্না ও চন্দ্রা সুযোগ পায় তাদের প্রতিভার জন্য। প্রত্যন্ত বাগিচার মেয়েরা যে সংসারের হাজারো অভাব অনটনের মধ্যেও এই সাফল্যের কৃতিত্ব অর্জন করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট রাগবি সেভেন সিরিজ প্রতিযোগিতার আসরে নেপাল, উত্তর কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, গুয়ামের পাশাপাশি ভারতও অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে অংশগ্রহণ করেছে সরস্বতীপুর চা-বাগিচার অবহেলিত শ্রমিক পরিবারের নারীরা, এ কি গর্বের কথা? ডুয়ার্সের চা-বাগিচা বলতে এখন অনেকেই বোঝেন অর্ধাহার, অনাহার এবং অপুষ্টিতে শ্রমিকের মৃত্যু। তার বাইরেও যে থাকে অনেক কৃতিত্বের কাহিনি সেটা কতজন জানে? দেশের হয়ে সাফল্য অর্জন করার মধ্য দিয়ে চা-বাগিচার ইতিহাসে নতুন পালক যুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁরা। তাই স্বপ্নার মা শান্তি ওঁরাও এবং চন্দ্রার মা লখীমণি ওঁরাওয়ের বক্তব্য, 'হামরি বেটিয়া দেশ কে লিয়ে চুনে গ্যয়ে, হাম চাহতে হ্যায় কি ইয়ে দো বেটিয়া জান পে জান দেকে খেলে অউর দেশ কা, হামারে চায়ে বাগান কি নাম হর কোণে কোণে মে রোশন করে।

যোগেশচন্দ্র বাগানে ক্রেশের করুণ হাল

> "আনন্দপুর চা-বাগিচায় ২০১২ সালের নভেম্বর মাস থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগানে ক্যান্টিন আছে। মালিকপক্ষের ভর্তুকি নেই। বাগিচার একটিমাত্র ক্রেশে ৩ জন অ্যাটেনডেন্ট আছে। ক্রেশগুলিতে শৌচাগার, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, দুধ বিস্কুটের ব্যবহার আছে। দুধের গুণগত মান ভাল নয় বলে শ্রমিকদেরই অভিযোগ।"

আনন্দপুর চা-বাগান

একটা অদ্ভুত ভালোলাগার আবেশ নিয়ে রওনা দিলাম আনন্দপুর চা-বাগিচার উদ্দেশে। অনেক দেরী করে ফেলায় আজকের সার্ভের কাজ অসমাপ্ত রাখলে অসম্ভব চাপে পড়তে হবে। রোশনকে অভিনন্দন জানিয়ে মেগা পর্যটন হাব 'ভোরের আলো' কে সঙ্গী করে ক্যানেলের পাশ দিয়ে ক্যানাল রোড ধরে রওনা দিলাম আনন্দপুরের দিকে। আনন্দপুর চা-বাগনকে ঘিরে যে বাগিচাগুলি রয়েছে সেগুলি হল কৈলাসপুর, যোগেশচন্দ্র, নেপুচাপুর, গজলডোবা, নেওড়ানদী, ডামডিম, কুমলাই, নিউ গ্লেনকো চা-বাগিচাগুলি। বাগিচার

ম্যানেজারকে গিয়ে পরিচয় দিতে স্বাগত জানালেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাগানের ম্যানেজার ছিলেন অনীক ব্যানার্জি। মাল মহকুমার আনন্দপুর চা-বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী নিউ চামটা টি কোম্পানি। ১৮৮৯ সালে কোম্পানির জন্ম। সেই হিসাব ধরলে প্রায় ১১৯ বছরের পুরনো বাগানটি ডিবিআইটিএ-র সদস্য। বর্তমান পরিচালকবর্গ ১৯৯৬ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ১০ জন। কলকাতার ম্যাকলয়েড হাউসে কোম্পানির হেড অফিস। কোম্পানির মালিকের নাম শারদ বাজোরিয়া, পরিচালকবর্গ নিরজ কুমার ঝুনঝুনওয়ালা, গৌরী বাজোরিয়া, জগদীশ মিনোত্রা, ধনরাজ বৈদ। শারদ বাজোরিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অন্যান্যরা ডিরেক্টর। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ৫টি এগুলি হল পি.টি.ডব্লউ.ইউ, সি.বি.এম.ইউ, টি.টি.পি.ডব্লউ.ইউ, ডব্লউ.ই.বি.সি.এম.এস, জে.সি.বি.ডব্লউ.ইউ। কোম্পানির ফোন নং ৮৬৯৭৭২২২০০। আনন্দপুর চা-বাগানের আয়তন ৬৩১.৭ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৬৩১.৭ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ ৬.০৬ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ২০ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৩৯৫.৪৫ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৩৯৫.৪৫ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৭৬০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। সেচযোগ্য জমি ১৯৮ হেক্টর।

আনন্দপুর চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৫৫ জন। করণিক ৬ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ৪ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৭৫২ জন। মোট জনসংখ্যা ৪০২৮। স্থায়ী শ্রমিক ১৩৪০ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ৪৫৬ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৮০ জন। চুক্তিবদ্ধ বস্তিয়ার শ্রমিক সংখ্যা ১০৩ জন। কম্পিউটার অপারেটর ২ জন। সর্বমোট সাবস্টাফ ৫৫ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৪। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৪৯১ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ২৫৩৭ জন।

আনন্দপুর চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৩০-৩৫ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৭-৮ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ গড়ে ৫-৭ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ১২-১৩ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক প্রকৃতির। আনন্দপুর বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে উন্নতমানের বাগান।

> যোগেশচন্দ্র চা-বাগানে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে টাকা জমা পড়া এবং শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ আছে জয়েন্ট ফোরামের। শতাধিকেরও বেশি শ্রমিকের প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থও বকেয়া, বছরে গড়ে ১০ জন শ্রমিক অবসর গ্রহণ করে, গ্র্যাচুইটি পাওয়ার কথা থাকলেও কোনও সময়েই তা সঠিক সময়ে পায় না শ্রমিকেরা।

বহু চা কারখানাতে এখন উৎপাদন বন্ধ

আনন্দপুর চা-বাগানে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ২৮৫টি। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ৪৬৭। মোট শ্রমিক আবাস ৭৫২টি। মোট শ্রমিকসংখ্যা ১৪৯১ জন। বাগানে শতকরা ৭৭ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে।

আনন্দপুর চা-বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটি। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/ আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই। মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৮টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৩টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড নেই, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। বাগিচায় হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে ৫০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। বাগিচায় ডাক্তার আছে, নাম এন সিং। আবাসিক ভিত্তিতে তিনি বাগিচায় নিযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিবিএস। ডাক্তারের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত। প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। কম্পাউন্ডার এক জন। স্বাস্থ্য সহযোগী একজন। বাগিচায় মোটামুটি সব ধরনের ওষুধ সরবরাহ করা হয়। উন্নতমানের পথ্যও দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ডাক্তারের নির্দেশ মেনে ডায়েট চার্ট অনুযায়ী ডায়েটও দেওয়া হয়। মেটারনিটি সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকের বাৎসরিক গড় ২১ জন। আনন্দপুর চা-বাগিচায় ২০১২ সালের নভেম্বর মাস থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগানে ক্যান্টিন আছে। মালিকপক্ষের ভর্তুকি নেই। বাগিচার একটিমাত্র ক্রেশে ৩ জন অ্যাটেনডেন্ট আছে। ক্রেশগুলিতে শৌচাগার, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, দুধ বিস্কুটের ব্যবহার আছে। দুধের গুণগত মান ভাল নয় বলে শ্রমিকদেরই অভিযোগ। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চ বিদ্যালয় অনেক দূরে। শ্রমিক সন্তানদের বাসে করে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। তবে বাসের সংখ্যা একটিমাত্রই। অন্য যানবাহনের ব্যবস্থাও নেই। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ দুইই আছে।

আনন্দপুর চা-বাগানে প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া নেই। গড়ে ৫০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা পড়ে বছরে। শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। রেশনও বকেয়া পড়ে থাকে না। বছরে গড়ে ২০ জন শ্রমিক ৩০ লাখ টাকার মতো গ্র্যাচুইটি পায় তবে বেশ

কিছু শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি বকেয়া রাখার তথ্য পাওয়া গেছে বাগানের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের কাছ থেকে।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগান

চায়ের জগতে শিল্পপতি হিসাবে সুনাম, দুর্নাম দুটিই আছে নরেন্দ্র বেরেলিয়ার। মালবাজার মহকুমার যোগেশচন্দ্র টি গার্ডেনটির পরিচালকগোষ্ঠী মালহাটি টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। অরুণ বেরেলিয়া, বসন্তকুমার বেরেলিয়া এবং নরেন্দ্র বেরেলিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ডিবিআইটিএ সূত্রে প্রকাশ বিগত দিনে মকাইবাড়ি টি গার্ডেনের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ডুয়ার্সের সমস্যাদীর্ণ কাঁচালগুড়ি, শিকারপুর ভান্ডারপুর, রামঝোরা বাগানটি কিনে নেন। যোগেশচন্দ্র চা-বাগানটিও নরেন্দ্র বেরেলিয়া বিগত মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে চালাচ্ছেন দক্ষতার সঙ্গেই। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি মানবিক মুখও আছে বেরেলিয়ার। তাই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রিপ্ল্যান্টেশন, রিজুভিনেশন, উচ্চমানের প্রুনিং বা অন্যান্য পরিচর্যার জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু বোনাস, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রদান বা শ্রমিক কল্যাণকর কর্মসূচি নিয়ে শাসকদলের শ্রমিক সংঘ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের যেমন ক্ষোভ আছে, তেমনই আছে জয়েন্ট ফোরামের। বেরেলিয়া সাফল্যের সঙ্গে ১৫ বছর ধরে আলিপুরদুয়ারের আটিয়াবাড়ি চা-বাগানটি চালাচ্ছেন। বাগানটি ডিবিআইটিএ-এর সদস্য। ২০০৯ সালে কোম্পানি বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ১০ জন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাগানের ম্যানেজার ছিলেন পরভিন্দর সিং। যদিও ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী সময়কালে ম্যানেজার বদল হয়েছেন কি না তা জানা যায়নি। হেড অফিস সেবক রোড, দো মাইল, শিলিগুড়ি, বাগানের ম্যানেজার শৈলেন্দ্রচন্দ্র রাই এর কাছ থেকে পাওয়া গেল বাগান সম্পর্কিত তথ্যাবলী। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ৬টি। এগুলি হল ডিসিবিডব্লুউ, সি.বি.এম.ইউ, এন.ইউ.পি.ডব্লুউ, ডব্লুউ.বি.সি.এম.এস, পি.টি.ডব্লউ.ইউ, ডব্লুউ.টি.জি.ই.এ।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগানের আয়তন ৫৭৭.১১ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৫৭৭.১১ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১২৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৪৩৯.৯৭ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৪৩১.৯৭ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২১৮৬ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগিচার সাব স্টাফের

নেপুচাপুর ফ্যাক্টরি

সংখ্যা ৬০ জন। করণিক ৭ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ৯ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ১২১৮ জন। মোট জনসংখ্যা ৫০৪৪ জন। স্থায়ী শ্রমিক ১১৯৯ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) ছিল না। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০০ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বাগানে নেওয়া হয়নি। কম্পিউটার অপারেটর একজন আছে। সর্বমোট সাবস্টাফ ৬০ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৭। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৩৭৬ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৩৬৬৮ জন।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগিচায় নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ১৫ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা গড়ে ৩ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা-পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ খুবই সামান্য। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ গড়ে ৩ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক। যোগেশচন্দ্র চা বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে মধ্যম মানের বাগান।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগিচায় ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ি ৬৮৫, আধা পাকাবাড়ি ১২৬, অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ২৫০, সরকারি সহায়তায় তৈরি বাড়ি ১১টি। মোট শ্রমিক আবাস ১০৭২। মোট শ্রমিকসংখ্যা ১৩৭৬ জন। বাগানে শতকরা ৭৮ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে।

বাগিচায় হাসপাতাল আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে, আবাসিক ভিত্তিতে স্থায়ী ডাক্তার আছে। নাম সঞ্জয় বরাট। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা অনুমোদিত না হলেও কাজ চলে যায়। বাগিচায় হাসপাতালে প্রশিক্ষিত নার্স ৩ জন, কম্পাউন্ডার বা সহযোগী অ্যাটেন্ডন্ট বা আয়া নেই। বাগিচার হাসপাতালে মেল ওয়ার্ড ৭টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৭টি, আইসোলেশন ওয়ার্ড ৪টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। আলাদাভাবে পুরুষ ও মহিলা আইসোলেশন ওয়ার্ড বা মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। অপারেশন থিয়েটারও নেই। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে শতাধিক শ্রমিককে রেফার করতে হয় কারণ বাগিচার আশপাশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ পাওয়া যায় না বলেও শ্রমিকদের অভিযোগ। হাসপাতালে উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না, ডায়েট চার্ট মেনে অসুস্থ রোগীদের খাবার দেওয়া হয় না, ওষুধের স্টক রেজিস্টার নেই, ওষুধের তালিকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না বলেও শ্রমিকদের অভিযোগ। যোগেশচন্দ্র চা-বাগানে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই, দুটি ক্রেশ এবং ২ জন অ্যাটেন্ডেন্ট থাকলেও শিশুরা দুধ, বিস্কুট, পুষ্টিকর খাবার, পোশাক পরিচ্ছদ পায় না। শৌচাগারের অবস্থাও উন্নতমানের নয়, এমনকি পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও নেই। পাইপলাইন প্রায়শই খারাপ থাকে। পানীয় জলও সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ আছে। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয় দূরে কিন্তু শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।

যোগেশচন্দ্র চা-বাগানে প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে টাকা জমা পড়া এবং শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ আছে জয়েন্ট ফোরামের। শতাধিকেরও বেশি শ্রমিকের প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থও বকেয়া, বছরে গড়ে ১০ জন শ্রমিক

অবসর গ্রহণ করে, গ্র্যাচুইটি পাওয়ার কথা থাকলেও কোনও সময়েই তা সঠিক সময়ে পায় না শ্রমিকেরা। তবে শ্রমিকেরা মজুরি, রেশন, চপ্পল, ছাতা, কম্বল পায়। নোট বাতিলের পর মজুরি সংকট এড়াতে বাগানের ১২৭৯ জন শ্রমিক কর্মচারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া চলছিল। বাগানের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র রাই নোট বাতিলের পর যখন ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়েছিলাম তখন জানিয়েছিলেন ক্যাশলেস ব্যবস্থা শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে চালু হওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যক। ব্যাঙ্ক অব বরোদা শিলিগুড়ি শাখার দু'জন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ফর্ম জমাও নেওয়া হয়। কিন্তু এবারের ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে দেখা গেল আগের ব্যবস্থাই পুনর্বহাল রয়েছে।

নেপুচাপুর চা-বাগান

টাই অর্থাৎ টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সদ্যসভুক্ত নেপুচাপুর টি কোম্পানি লিমিটেড-এর অন্তর্ভুক্ত মালবাজার মহকুমার নেপুচাপুর টি গার্ডেনটির পরিচালকগোষ্ঠী ১৯২৭ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানটির বর্ষীয়ান ডিরেক্টর বেলা দেবী মৈত্র ১৯৬৭-এর ১৫ ডিসেম্বর ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করলেও বর্তমানে কোম্পানির অন্যতম পরিচালক শ্যামল সেন এবং শোভন সমীরেশ দাশগুপ্ত ২০০৫ এর ২৮ জানুয়ারি, শর্মিলা সেন ২০০১-এর ১৮ ডিসেম্বর এবং সোহম সেন ২০০৮-এর ১০ জানুয়ারি থেকে বাগান পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৬ জন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাগানের ম্যানেজার রাজমোহন ভট্টাচার্যর কাছ থেকে জানা গেল কোম্পানির হেড অফিস কলকাতার এস.এন.সি. দত্ত সরণিতে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ৪টি। এগুলি হল সি.বি.এম.ইউ, টি.ডি.পি.ডব্লুউ.ইউ, পি.টি.ডব্লিউ.ইউ, ডি.সি.বি.ডব্লুউ.ইউ।

নেপুচাপুর চা-বাগানের আয়তন ৪০০.০২ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৩৪১.৬ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ ৫ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৩৩.২২ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৩৪১.০৬ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগী এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২১০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

নেপুচাপুর চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৪১ জন। করণিক ১০ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ৫ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৫৭৯ জন। মোট জনসংখ্যা ২৩৬৩। স্থায়ী শ্রমিক ৫৭৯ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘাশ্রমিক) সংখ্যা ৪০০ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৯৮ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা ১১৬ জন। কম্পিউটার অপারেটর এক জন। সর্বমোট সাবস্টাফ ৪১ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল এবং স্থায়ী শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জন। মোট কর্মরত শ্রমিক ৭৫০ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ১৬১৩ জন।

নেপুচাপুর চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ২৪-৩০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা গড়ে ৬-৭ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ২.৫-৩ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৯-১০ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি কোয়ালিটি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক প্রকৃতির। নেপুচাপুর বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে উন্নতমানের বাগান।

> নেপুচাপুর চা-বাগানে হাসপাতাল এমনকি আশপাশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। তবে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাই বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিকদের। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে মাসে শতাধিক শ্রমিককে রেফার করা হয়। আবাসিক ভিত্তিতে বাগানে ডাক্তার থাকলেও ২০০০ সাল থেকে নার্স না থাকার ফলে তিনি ঠুঁঠো জগন্নাথ ছাড়া আর কিছুই নন। কম্পাউন্ডার আছে এক জন এবং হেলথ অ্যাটেনডেন্ট আছে একজন।

বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স এবং চা বিক্রিবাবদ আয় থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার নেপুচাপুর টি কোম্পানি লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ০৪.০৭.৩২।

নেপুচাপুর চা-বাগানে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ৩৯২। আধা পাকা বাড়ির সংখ্যা ৯৫। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ১৩০। মোট শ্রমিক আবাস ৬১৭টি। মোট শ্রমিকসংখ্যা ৭৫০ জন। বাগানে শতকরা ৮২ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। চা-বাগানে শৌচাগারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বাগানে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে আবেদনের তারিখ ২০০৯।

নেপুচাপুর চা-বাগানে হাসপাতাল এমনকি আশপাশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। তবে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাই বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিকদের। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে মাসে শতাধিক শ্রমিককে রেফার করা হয়। আবাসিক ভিত্তিতে বাগানে ডাক্তার থাকলেও ২০০০ সাল থেকে নার্স না থাকার ফলে তিনি ঠুঁঠো জগন্নাথ ছাড়া আর কিছুই নন। কম্পাউন্ডার আছে এক জন এবং হেলথ অ্যাটেনডেন্ট আছে একজন। ডাক্তারের নাম দীলিপ চন্দ। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা আইএমএ দ্বারা অনুমোদিত না হলেও তিনি কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন বাগান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ থাকে না, ওষুধের তালিকা নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না, উন্নতমানের পথ্য বা নিয়মিত ডায়েট চার্ট তো রোগিদের কাছে স্বপ্ন। মেটারনিটির জন্যও রেফার করতে হয় অথবা আশা কর্মী বা স্বাস্থ্যদপ্তরের সরকারি সুযোগসুবিধা নেওয়ার মাধ্যমে সমস্যা মেটানো হয়। ১৬.০৭.২০১১ সাল থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। নাম বিশ্বজিৎ পন্ডিত।

নেপুচাপুর বাগানে ক্যান্টিন নেই, ভরতুকির তাই প্রশ্নই নেই। বাগিচার ২টি ক্রেশের মানই উন্নত নয়। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকলেও ক্রেশে শৌচাগার নেই বললেই চলে। দুধ, বিস্কুট, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে। নিয়মিত পোশাক বা শীতবস্ত্রও শিশুদের দেওয়া হয় না। পানীয় জল ব্যবহারযোগ্য নয় বলেও নারী শ্রমিকদের ক্ষোভ আছে। ক্রেশে বাচ্চা থাকে অনেকগুলিই। অ্যাটেন্ডেন্টের সংখ্যা ৭জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগানের একটি মারুতি ভ্যানে করে শ্রমিক সন্তানদের পাশ্ববর্তী বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা দেখে বোঝাই যায় বাগিচায় পড়াশোনার কী মান। বাগিচায় বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ আছে।

প্রভিডেন্ড ফান্ড, মজুরি, বোনাস, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি নেপুচাপুর বাগান থেকে। কোম্পানির হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সদর্থক কোনও প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি।

ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা ভিউ পয়েন্ট ১৫ কিমি। গজলডোবা ভিউ পয়েন্ট থেকে সরস্বতীপুর ৫ কিমি। সরস্বতীপুর থেকে আনন্দপুর টি গার্ডেন ১৭ কিমি। আনন্দপুর টি গার্ডেন থেকে যোগেশচন্দ্র টি গার্ডেন ৯ কিমি। যোগেশচন্দ্র টি গার্ডেন থেকে নেপুচাপুর ৩১ কিমি। সবক'টা বাগান ঘুরতে ওদলাবাড়ি বা ক্রান্তি থেকে গাড়িতে নেবে ১২০০-১৫০০ টাকা।

Adventure Sports first time ever at any eco-resort in Dooars

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;

Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9474904461, 9002722699

Mystic Murti mesmerises over Gorumara where luxury meets excitement

নয়া পর্যটন নীতি স্বাগতম!

কোচবিহার থেকে কালিম্পং হোক রাজ্যের প্রথম ইকো টুরিজম সার্কিট

গত সংখ্যায় প্রতিবেদনের শেষে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছিল পাহাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে। আমার বক্তব্য ছিল, দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে অর্থাৎ পানীয় জল, রাস্তাঘাট, চা-কমলালেবু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কখনই আন্দোলনে বসতে দেখা যায়নি গুরুং-হরকাদের— যার ফলে ‘ক্ষীর’ খেয়ে যাচ্ছে বাইরের মানুষ। অথচ পাহাড়ি মানুষের অবস্থার রোজ একটু করে অবনতি হচ্ছে।

আলাপ আলোচনায় আসর যখন সরগরম তখন আবির্ভাব আমাদের আর এক বন্ধু, পেশায় ড্রাইভার, আনমোল ছেত্রীর। চোখেমুখে উত্তেজনা। হাঁপাচ্ছে। আমাদের কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একেবারে মাঝখান থেকে শুরু করল। ‘বাঘ, আবার বাঘ’। পর্যটন, উন্নয়ন, বিবাদ-বিতর্ক তখন মাথায় উঠেছে সবার। সমস্বরে বলে উঠলাম ‘বাঘ! কোথায় কখন?’

আনমোল কিন্তু কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না। ও নিজের মনে বলেই যাচ্ছে ‘একটা নয় তিনটে। আমি দেখেছিলাম একটা। কিন্তু গতবারেও তিনটে, আর এবারেও তিনটে...’

প্রাথমিক উত্তেজনার রেশ কাটলে বোঝা গেল, কালিম্পং জেলার নেওরাভ্যালি জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় বসানো ক্যামেরা-ফাঁদে তিনটি রয়্যাল বেঙ্গলের হদিশ মিলেছে। এটা প্রথম নয়। ২০১৭ সালেও নেওরাভ্যালিতে তিনটি বাঘ দেখা গিয়েছে। প্রথমটি দেখেছিল আনমোল ছেত্রী। ২০১৭ জানুয়ারি মাস। সকাল সাতটা। পেডং-লাভা রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে আসার সময় বাঘটিকে দেখে আনমোল। শুধু দেখে না, ছবিও তোলে। গোটা দেশে তোলপাড় পড়ে যায় সেই ছবিতে। কেননা উত্তরবঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল আছে, এ নিয়ে দাবি ও পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেলেও আনমোলের তোলা ছবি, একমাত্র প্রমাণ। তারপর বন দফতর ক্যামেরা-ফাঁদ বসায় এবং ২০১৭ তে আরও দুটি বাঘের সন্ধান পায়। একটিকে দেখা গিয়েছিল আলগারা ও লাভা-র মাঝামাঝি এলাকায়। অন্যটি ছিল স্ত্রী রয়্যাল বেঙ্গল। ভোরবেলা দেখা গিয়েছিল, নেওরাভ্যালি জাতীয় উদ্যানের চৌদাফেরি এলাকায়।

তার মানে ২০১৭তে তিনটি এবং ২০১৮তে তিনটি। আনমোল আসলে বলতে চাইছে, আগেরবারের তিনটি রয়্যাল বেঙ্গল এবং এবারের তিনটি কি একই? নাকি আলাদা? এটাই ওর উত্তেজনার কারণ। যদিও আমার মনে অন্য প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে। দুবার-ই, শীতকালেই কেন দেখা মিলল বাঘের? এদের মধ্যে বাঘিনী কি সন্তানসম্ভবা ছিল? একমাত্র সন্তানসম্ভবা হলেই বাঘিনী বিভিন্ন কারণে লোকালয়ের বেশ কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু সে যাই হোক, গভীর গহন আদিম অরণ্য নেওরভ্যালিতে বাঘের উপস্থিতি, পরিবেশ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশাল খবর। যদিও অনেকগুলো ‘কিন্তু’ আছে।

ইকো পর্যটনকে বুড়ো আঙুল বক্সা বনে!

চৌত্রিশ বছরের বাম জমানায় রাজ্যে পর্যটন, বন এবং পরিবেশ দপ্তরকে একটি প্ল্যাটফর্মে কোনদিনও আনা যায়নি। যে যার মতো কাজ করেছে এবং মানুষের দেওয়া করের পয়সা জলে গিয়েছে। পর্যটন, বন, পরিবেশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একসঙ্গে কাজ না করলে কি বিপত্তি হতে পারে সেটা আমরা দেখেছি বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এরিয়ায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ‘কনসেন্ট লেটার’ না নিয়ে কীভাবে ৬৯টি বেসরকারি হোটেল, ৪টি সরকারি অতিথিনিবাস এবং বন দফতরের ১৬টি অতিথিগৃহ তৈরি হয়েছিল। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশে ২০১৭ অক্টোবরে সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ডুয়ার্সের কিছু মানুষ ও অসরকারি সংস্থা যারা প্রতিদিন ডুয়ার্সের ক্ষতি করে ডুয়ার্সকে নিয়ে পয়সা রোজগার করে তাদের প্রশ্রয় ও সমর্থনে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে ২০১৭ বছর শেষে— বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রত্যেকটি বেসরকারি হোম-স্টে পর্যটকদের জন্য খোলা ছিল এবং খ্রিস্টামাসের ছুটিতে পর্যটকরা রাত কাটিয়েছেন সেখানে।

এ বিষয়ে একটি সংবাদসংস্থাকে ‘একগান হেসে’ ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেছেন ‘রিফ্রেশমেন্টের’ জন্য খোলা ছিল কিন্তু রাতে কেউ থাকেনি। তার মানে পার্থসারথি জানতেন এবং পূর্ণ সমর্থন ছিল বেআইনি হোম-স্টে

ছবি তাপস দাস, আইএফএস

ছবি সোমনাথ খাসকেল

আবারও খুলে দেওয়ার? ডুয়ার্সের পরিবেশ, পর্যটন এবং রাজ্যের সম্মানের স্বার্থে পার্থসারথিকে নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী প্রমাণিত হলে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা উচিত। বক্সা টাইগার রিজার্ভের বন্ধ হয়ে যাওয়া যে কোনও হোম-স্টে তে দিনে বা রাতে এক ঘণ্টার জন্য থাকলেও সেটা বেআইনি। হোম-স্টে মালিক এবং পর্যটক দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা উচিত। এবং কোন পর্যটন সংস্থা, সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্যক্তিগতভাবে হোম স্টে খোলা রাখতে প্রশ্রয় দিলে তাকেও বেআইনি কর্মকাণ্ডে উস্কানি দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখা ভাল, বছর শেষে বক্সায় হোম-স্টে খোলা রাখার অব্যবহিত পরেই ১০ জানুয়ারি ২০১৮, রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক বাইসনের। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ এবং বন দফতরের তৎপরতায় বাইসনের দেহ পাচারকারীরা নিয়ে যেতে পারেনি। কারও কারও অনুমান, চোরাগোপ্তা বাজারে ২৫০ টাকা কেজি দরে বাইসনের মাংস বিক্রির প্ল্যান ছিল পাচারকারীদের। মৃত বাইসনটির ওজন প্রায় ৭০০ কেজি। ১৯৭২-এর আইন অনুযায়ী বাইসন হত্যা করলে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

কি পার্থসারথিবাবুরা, হাসি পাচ্ছে এখনও? 'রিফ্রেশমেন্টে' তো কোনও দোষ নেই, তাই না! যাই হোক, বাইসনের মাংস দিয়ে ভালই 'রিফ্রেশমেন্টের' আয়োজন করেছিল পাচারকারীরা। 'দ্য টেলিগ্রাফ'-কে দেওয়া আপনার 'রিফ্রেশমেন্ট' থিওরি খতিয়ে দেখা উচিত বন দফতরের। বাইসনের গায়ে কোনও বুলেট মার্ক নেই। মাংস বিক্রি উদ্দেশ্য হলে বিষ দিয়ে মারেনি। তাহলে মারল কীভাবে? নিঃশব্দে জাতীয় উদ্যানের ভিতরে একটি হত্যা। এক্ষেত্রে বাইসন এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ। যে কোনও মুহূর্তে এই মসৃণ অপারেশানের টার্গেট হতে পারে কালিম্পং-এ নেওরাভ্যালির রয়্যালবেঙ্গল কিংবা বক্সা থেকে কোচবিহারের চিলাপাতা জঙ্গলে আসা বাঘ।

"বাইসনের গায়ে কোনও বুলেট মার্ক নেই। মাংস বিক্রি উদ্দেশ্য হলে বিষ দিয়ে মারেনি। তাহলে মারল কীভাবে? নিঃশব্দে জাতীয় উদ্যানের ভিতরে একটি হত্যা। এক্ষেত্রে বাইসন এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ। যে কোনও মুহূর্তে এই মসৃণ অপারেশানের টার্গেট হতে পারে কালিম্পং-এ নেওরাভ্যালির রয়্যালবেঙ্গল।"

ইকো পর্যটন মানে কিন্তু সেই মা-মাটি-মানুষ!

২০১১-র পর প্রতিদিন বন, পর্যটন, পরিবেশ— প্রতিটি দফতরে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে যেটা বাম জমানায় ভাবনার অতীত ছিল। কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই করা গেল না। বন, পর্যটন, পরিবেশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে কিছুতেই একটা জায়গায় আনা গেল না। সবাই যে যার

মতো কাজ করছে কিন্তু একে অপরের সঙ্গে তালমিল নেই। এবং ঐ সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে একশ্রেণির দুষ্টু ব্যক্তি, সংস্থা এবং ব্যবসায়ী। এদের জন্যেই দেশে এবং দেশের বাইরে রাজ্যের নাম কালিমালিপ্ত হচ্ছে। অথচ প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কীভাবে দেশে-বিদেশে রাজ্যকে সামনের সারিতে নিয়ে যাওয়া যায়। বহু প্রতীক্ষিত পর্যটন নীতি তৈরি। পর্যটন দফতরের দায়িত্বে অত্রি ভট্টাচার্যের মতো একজন দাপুটে আমলা, কিন্তু বন, পর্যটন, দফতরের তালমিল না থাকায় এখনও অনভিপ্রেত যে সব ঘটনা ঘটছে সেটা সাসটেইনেবল পর্যটনের ক্ষেত্রে লজ্জার বিষয়। ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে বা পৃথিবীর অনেক দেশেই, সমগ্র পর্যটন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে মানুষ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কিছুর ক্ষতি না হয়। একদম সোজাসাপটা ভাষায় মমতা ব্যানার্জির ভাষাই ধার করে বলা যায়, সাসটেইনেবল পর্যটন মা-মাটি-মানুষ-এর মতো সহজ ও জোরালো স্লোগান আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। এতে কেউ যদি মনে করেন যে মমতা ব্যানার্জিকে তেল দিচ্ছি, ভাবতে পারেন, ভাবনায় বাধা দেব না। কিন্তু এই স্লোগানটাই যদি জার্মান প্রধানমন্ত্রী এঞ্জেলা মেরকেল-এর থেকে আসত তাহলে কিন্তু মা-মাটি-মানুষ নিয়ে তত্ত্ব-আলোচনায় ভাসিয়ে দিতেন। ভেবে দেখুন একবার! আমার ধারণা গান্ধিজি বেঁচে থাকলে এই স্লোগান ওনারও খুব পছন্দ হত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পর্যটনকে আজ সাসটেইনেবল হতেই হবে। এবং হিমালয়, ডুয়ার্স, তরাই, সুন্দরবনে পর্যটন সাসটেইনেবল না হলে প্রকৃতি (মানে 'মা'), ভূখণ্ড (মানে 'মাটি') এবং 'মানুষ' কিছুই থাকবে না। 'মা' মানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইকোলজি বা বাস্তুসংস্থান, সেই 'মা'-কে বাঁচাতে হবে। এর জন্য যে কোনও রাজনৈতিক দল করবার দরকার নেই সেটা সম্ভবত ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি পার্থসারথিবাবুদের মাথায় এখনও ঢোকেনি

"পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন, কোচবিহার থেকে কালিম্পং এই এলাকাই রাজ্যকে এনে দিতে পারে সোনার সম্মান। 'জল-জঙ্গলে-ইতিহাসে জমজমাট' একটি পরিবেশ পর্যটনের প্যাকেজ। ডুয়ার্স, তিস্তা আর নেওরাভ্যালি— ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি ফ্রান্স, জার্মানি, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়ান এবং লাতিন আমেরিকার বন্ধু পর্যটকরা বারেবারে উত্তেজিত হয়েছেন যখন তাদের নিয়ে ঘুরেছি ডুয়ার্স, তিস্তা আর নেওরাভ্যালি-তে।"

এবং সে কারণেই বুঝে বা না বুঝে অর্থবহ স্লোগানটির অবহেলা বা অপমান করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন, কোচবিহার থেকে কালিম্পং এই এলাকাই রাজ্যকে এনে দিতে পারে সোনার সম্মান। 'জল-জঙ্গলে-ইতিহাসে জমজমাট' একটি পরিবেশ পর্যটনের প্যাকেজ। ডুয়ার্স, তিস্তা আর নেওরাভ্যালি— ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি ফ্রান্স, জার্মানি, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়ান এবং লাতিন আমেরিকার বন্ধু পর্যটকরা বারেবারে উত্তেজিত হয়েছেন যখন তাদের নিয়ে ঘুরেছি ডুয়ার্স, তিস্তা আর নেওরাভ্যালি-তে। আজ রাজ্যের প্রথম পর্যটন নীতি প্রস্তুত, যেটি হওয়ার কথা ছিল তিরিশ বছর আগেই। তবে অবশ্যই 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। আমরা মনে প্রাণে চাইব, কোচবিহার থেকে কালিম্পং এই আনকোরা এলাকা জুড়ে গড়ে উঠুক রাজ্যের প্রথম টুরিজম সার্কিট। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাবেন স্থানীয় মহিলারা, ভাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা, সরকারি আওতার বাইরে থাকা স্বাধীন পর্যটন গবেষক-কর্মীরা। এ সবকিছুই তিনদিনে হয়ে যাবে এমন আশা করলে চলবে না। দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যে সরকার এই কাজ শুরু করবে সেই সরকারকে সহজে কেউ পরিবর্তন করতেও চাইবে না। দীর্ঘদিন ধরে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য স্থিতিশীল সরকার খুব জরুরি এবং তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এটাই সঠিক সময়।

তবে এখন প্রাণভরে মিষ্টি দার্জিলিং ম্যান্ডারিন খাওয়ার সময়। কৃষিবিজ্ঞানী বন্ধু ড. নাতাশা গুরুং, আনমোল ছেত্রী-র সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রচুর হয় কালিম্পং-এ। নাতাশার সঙ্গে আলাপ করাব আগামী সংখ্যায়। দিল্লি-কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে নিজভূমে, কালিম্পং-এ ফিরে কী অসাধারণ কাজটিই না করেছেন নাতাশা!

জয়ন্ত গুহ

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

পাখিরাই জমিয়ে দিতে পারত ডুয়ার্সের ইকো পর্যটন !

প্রশ্ন এক। পাখি নিয়ে ক'জন সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখতে পান বলুন তো? আজকাল দেখা যাচ্ছে শহর এলাকার কিছু স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়ে যাদের দামি টেলিলেন্স কেনার সাধ্য আছে, তারাই যা একটু-আধটু পাখি নিয়ে মাতামাতি করে। এর বাইরে পাখি-চর্চা হয় কোথায়?

প্রশ্ন দুই। এত খরচা করে পাখির ছবিটবি তুলে কেউ কেউ প্রাইজ-টাইজ পান কিন্তু পাখির কী লাভ হয় বলতে পারেন?

প্রশ্ন তিন। আচ্ছা পাখি নিয়ে অত ভেবে হবেটা কী বলেন তো? আমাদের মত খেটে খাওয়া ছাপোষা মানুষের পাখি-টাখি নিয়ে ভাববার সময় কি আছে?

প্রশ্ন চার। আমাদের জীবনে পাখি-প্রেম কবিতা গান আর দড়িতে ঝোলানো খাঁচার বাইরে কোনওদিন বেরিয়েছে?

নানা মহল থেকে উঠে আসা এই চারটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটু ডুব দিয়ে গভীরে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় মূল সমস্যাটা কোথায়, পাখি নিয়ে যেসব কর্মকান্ড চলেছে এখানে সেসব প্রচেষ্টা কতটা বিচ্ছিন্ন এবং অর্থহীন! **সেই পানকৌড়ি ডুব দেওয়া হল 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে।**

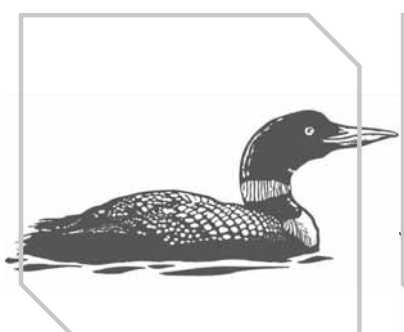

শীতের মরশুম শুরু হতেই ডুয়ার্স জুড়ে পরিযায়ী পাখির ঢল নামে এ খবর আজ আর কারও অজানা নয়। আর তাদেরকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বহিরাগতদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায় তরাই এবং ডুয়ার্সে আর হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। আসেন পরিবেশপ্রেমীরা, পক্ষীপ্রেমীরা, পক্ষী বিশেষজ্ঞরা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি এবং বনকর্মীরা মিলিত হয়ে পাখির ওপর কাজ করেন, সচেতনতা শিবির সংগঠিত করার দিকে নজর দেন, বার্ড ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেন, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সম্পর্কে ধারণালাভ করেন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন অলটিচুডে ভিন্নধর্মী পাখির ছবি লেন্সবন্দি করেন। আর এই উৎসাহ উদ্দীপনাকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার মানসিকতায় বনদপ্তরের উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে যে বার্ড ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০১৮-এর 'বক্সা বার্ড ফেস্টিভ্যাল' ছিল আরও আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজক। উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আসা পক্ষীপর্যটক এবং বিশেষজ্ঞ তথা ফটোগ্রাফার, বাছাই করা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা পাখি, বন ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে এবং কিছু পেশাগত ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় করা। এছাড়া পাখি এবং বন্যপ্রাণ বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শনী, বনবস্তির বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ফিল্ড ওয়ার্কের জমজমাটি অনুষ্ঠান ছিল। তীব্র শীতের প্রকোপ এবং ঘন কুয়াশার আলোআঁধারিতে পক্ষী পর্যবেক্ষণ কতটা করা গিয়েছে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরাই তাদের 'লেন্সবন্দি' উত্তর দিতে পারবেন, তবে উদ্যোগ এবং আয়োজন যে যথেষ্টই ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই সংরক্ষণকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি ডুয়ার্সে, যেটুকু সম্ভব হয়েছে প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশার মঙ্গলাজোড়িতে।

দেশের বৃহত্তম পাখি পর্যটন গড়ে উঠতে পারত ডুয়ার্সে

ভরতপুর নিয়ে যে পরিমাণ অতিকায় ইমেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে কিংবা এখন যে ব্র্যান্ড বিল্ডিং চলছে মঙ্গলাজোড়ি ঘিরে, আয়তনে বহুগুণহলেও তার পাঁচ শতাংশও হয়নি ডুয়ার্সে। এককথায় এই সত্য স্বীকার করছেন কলকাতার নামজাদা পক্ষিপ্রেমীরা এবং ইকো পর্যটন

গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রেব

বাংলায় এ পাখি পরিচিত বড় খোপা ডুবুরি নামে। জলে থাকা এই অসাধারণ সুন্দর পাখিটির প্রাণ সংশয় ঘটে তার ঝুঁটির জন্য। জলের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে ডাইভ দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য অতি চমৎকার। শিশুদের মাঝে মধ্যেই দেখা যায় বাবা-মায়ের পিঠে চেপে উপভোগ করছে মাছ শিকার।

সিট্রেন ওয়াগ টেইল

বাংলায় নাম খঞ্জনা। লেজ ঘন ঘন নাড়াতে থাকে বলে ইংরাজিতে এদেরকে ওয়াগ টেইল বলা হয়। এদের দেখলেই বোঝা যায় শীত আসছে।

কমন গ্রিন ম্যাগপাই

উত্তরাঞ্চল থেকে অরুণাচল, হিমালয়ের উপরের দিকেই থাকে এই পাখি। কাক প্রজাতির এই পাখি ছোট ছোট সাপ, পোকা, অন্য পাখির ডিম ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে।

সংস্থাগুলি। অথচ পাখি পর্যটনই এখানে গড়ে তুলতে পারত সত্যিকারের ইকো সাস্টেনেবল টুরিজম অর্থাৎ প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার পর্যটন। যেখানে সংস্থানের তাগিদেই প্রকৃতি-প্রাণ-সংস্কৃতি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয় স্থানীয় মানুষ।

উত্তরবঙ্গের কৃতী বনাধিকারিক মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল ঘোষের কাছ থেকে জানা গেল উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অলটিচুডে পাহাড়ের পাদদেশে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির সমাগম ঘটে। সুকনা বনাঞ্চলে বহুবিধ পাখির বাসা। বিভিন্ন অলটিচ্যুড অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখা যায়। নানাপ্রকার প্রজাতির পাখি তাই দেখা যায় সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল, নেওড়াভ্যালি, মহানন্দা, গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা বনাঞ্চলে। রসিকবিল, গজলডোবা, নারারথলি, কুলিকে আসে পরিযায়ী পাখিরা। ডুয়ার্সের এই সব অঞ্চলগুলিতে পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি। জেলার আর্দ্র চিরসবুজ জঙ্গলে অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের গাছপালার উপস্থিতিই পাখি বৈচিত্র্যের মূল কারণ। নানান প্রজাতির গাছপালার ফুল, ফল, বাকল ও শিকড়সহ ভিজা জঙ্গলে বসবাসকারী অসংখ্য কীটপতঙ্গ, ছোটবড় সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি ইত্যাদিকে পাখিরা তাদের পছন্দমতো খাদ্য হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে।

'বার্ড ফটোগ্রাফার' এবং পক্ষী বিশেষজ্ঞ বিরূপাক্ষ মিত্র জানালেন ডুয়ার্সের পরিযায়ী পাখি সম্পর্কিত কিছু তথ্য। প্রবল ঠান্ডায় পাখিরা হাই অলটিচ্যুড থেকে নেমে আসে লোয়ার অলটিচ্যুডে। শীত কমলে আবার নির্দিষ্ট অঞ্চলে চলে যায়। তাই পাহাড়ের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ধরনের পাখি দেখা যায়। যেমন ব্রাহ্মণী হাঁস বা চখাচখি বা রুডি শিল্ড যাদের বলা হয় সেই পাখিগুলিকে গজলডোবা ফুলবাড়ি অঞ্চলে দেখা যায় প্রত্যেক বছর ঠিক ৭ নভেম্বর। এটা খুবই বিস্ময়কর যে ক্যালেন্ডারের এই তারিখেই পাখিগুলি কীভাবে এসে পৌঁছায় দূরপ্রান্ত অতিক্রম করে এই অঞ্চলে। ৬ তারিখ বিকেলবেলাতে ফুলবাড়ি ব্যারেজে যে পাখিগুলিকে দেখা যায় না, সেই পাখিগুলিকে ৭ তারিখে ফুলবাড়িতে দেখা যাবেই, এমনকি সংখ্যায় অল্প হলেও। ২০১৭-র অক্টোবর মাসেও অন্যান্য পাখির ক্ষেত্রে একই চিত্র লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বিরূপাক্ষবাবুর উপলব্ধি পাখিরা একটানা পথ চলে না। তারা বিশ্রাম বা জলপানের জন্য রাস্তায় থামে। যেমন শীতকালে পাইড অ্যাভাসেট প্রজাতির পাখি গজলডোবাতে প্রত্যেক বছর দেখা যায় নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিনের জন্য, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে। পাখিগুলিকে স্টাডি করে দেখা গিয়েছে সেগুলি হয়ত একটা নির্দিষ্ট দিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারত বা অরুণাচলের দিকে যায়। এগুলির নাকটা একটু বাঁকা, এক ধরনের হাঁস এগুলি। ২০১৪ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বছর এরা গজলডোবায় দিন দুয়েক বিশ্রাম নেয়, অপেক্ষা করে, তারপর আবার উড়ে যায়।

ফুলবাড়ি পক্ষী পর্যটন

শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের একদিক দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী যার অপর পারে বাংলাদেশ। মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া। নদীর সামান্য ওপরের দিকে একটি ছোট ব্যারাজ যা মহানন্দা ব্যারেজ বা ফুলবাড়ি ব্যারেজ নামে পরিচিত। ব্যারেজটি দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা দুটিকে পৃথক করেছে। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক ব্যারেজটির দুই দিকে অবস্থিত। ফুলবাড়ি ব্যারাজটিকে কেন্দ্র করে একটি জলাভূমি গড়ে উঠেছে উত্তরদিকে যা আয়তনে ৮ বর্গ কিলোমিটার। ব্যারেজ থেকে উত্তরদিকে একটি দীর্ঘ বাঁধ চলে গিয়েছে রেলব্রিজ পর্যন্ত। নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি মাসে পরিষ্কার আবহাওয়ায় আরও দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্তার সুদৃশ্যমান। এরই মাঝে বিস্তৃত জলাভূমি। শরৎকালে তাই জলাভূমির মাঝে মাঝে যেখানে মাটির আভাস আছে সেখানে খেলে বেড়ায় মুনিয়া পাখির ঝাঁক। ফুলবাড়ি পর্যটনের দিক থেকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় জায়গা। জায়গাটির মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শীতকালে পরিযায়ী পাখির মেলা সহজেই দেশ বিদেশের পর্যটককে আকর্ষণ করতে পারে। গত শীতে ফুলবাড়িতে প্রচুর সংখ্যায় র‍্যাপটার এসেছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাইড হ্যারিয়ার, অসপ্রে, মার্স হ্যারিয়ার, শিকরা, পেরিগ্রিন ফ্যালকন, কমন ক্রেসট এবং ব্ল্যাক উইংগড কাইট। এছাড়াও পেঁচার বেশ কিছু 'স্পিসিস' চোখে পড়েছিল যার মধ্যে ছিল ইন্ডিয়ান স্কোপস আউল, ব্রাউন হক আউল, বর্গ আউল, শর্ট ইয়ার্ড আউল ইত্যাদি। গত শীতে আনুমানিক ৩৫ হাজার পাখি এসেছিল। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে ফুলবাড়ি অচিরেই জনপ্রিয় হবে এবং এটি হয়ে উঠবে প্যারাডাইস ফর বার্ড লাভার্স।

গজলডোবার শীতের অতিথিরা

এন জে পি স্টেশন থেকে গজলডোবা ৩৫ কিমি রাস্তা। তাই দিনে দিনে গাড়ি নিয়ে গজলডোবা ঘুরে আবার শিলিগুড়ি ফেরা যায়। সহজে যেতে হলে স্টেশন থেকে আমবাড়ি টোটোতে, আর সেখান থেকে শেয়ার গাড়িতে গজলডোবা। তিস্তার একদম গা ঘেঁষে রয়েছে থাকার জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের একটা বাংলো। স্থানীয় কয়েকজনের বাড়িতে পাখির ছবি তুলতে যাওয়া মানুষের রাত কাটানোর জন্য সাধারণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মোটামুটি ৪-৬ ঘণ্টা নৌকাভাড়া ১০০০ টাকা। নৌকার চালকেরাই গাইডের কাজে পারদর্শী।

বিশ্বে ন'হাজার প্রজাতির পাখির মধ্যে ভারতে ১২৩০ প্রজাতির পাখির সন্ধান মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গে আছে ৮১৪টি প্রজাতি। উত্তরবঙ্গে ৬৫০ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে যার মধ্যে শুধু গজলডোবাতেই ১৫১টি প্রজাতির পাখির সন্ধান মিলেছে। ফলে দেশজুড়ে গজলডোবার গুরুত্ব বাড়ছে। সারা বিশ্বে বিপন্ন প্রায় ১৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধানও গজলডোবায় মিলেছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে পাখিগুলির ছবি বিদেশী পক্ষীপ্রেমীদের আকৃষ্ট করেছে। শীতের শুরুতে প্রায় ১৫ হাজার পরিযায়ী পাখি আসে উত্তরের বিভিন্ন জলাশয়, বনভূমি এবং অরণ্যভূমিতে। লাদাখ, চিন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া ইউরোপ থেকেও নিয়ম করে পরিযায়ী পাখিরা গজলডোবায় আসে। তিস্তার বাঁধ দিয়ে ঘেরা জলে কৃত্রিম জলাশয়ে তারা কখনও ওড়ে, আবার কখনও বা ভেসে বেড়ায়। এর মধ্যে যেমন নর্দান ম্যাপউইং রয়েছে, তেমনই রয়েছে অতর্কিতে একসঙ্গে উড়ে যাওয়া লাল ঠোঁটওয়ালা চখা বা রুডিশেল ডাক।

ফাটাপুকুরে নিরিবিলিতে থাকত পরিযায়ীরা

দিঘির নাম ফাটাপুকুর। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের পথে জাতীয় সড়কের একেবারে গা ঘেঁষে প্রায় সাত একর জমি জুড়ে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন এই জলাশয়টি। শীতের মরশুমে এখানে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখির দল। জাতীয় সড়ক থেকে পুকুরটির দূরত্ব মাত্র ২০ মিটার হলেও পুকুরপাড়ের কিচিরমিচির সড়কপথ পর্যন্ত পৌঁছায় না বলে ভিনদেশিদের বিরক্ত করতে 'বেপাড়ার' কেউ পুকুরপাড়ে আসে না। কাজেই লোকালয়ের মধ্যে থেকেও শীতের কয়েকটা মাস বেশ নিরিবিলিতেই কেটে যায় দূর দেশ থেকে আসা এইসব অতিথিদের। তবে উষ্ণায়ণ আর বৃক্ষচ্ছেদনের জেরে সব জায়গাতেই পাখির সংখ্যা কমছে। ফাটাপুকুরও এর ব্যতিক্রম নয়। এলাকার বাসিন্দা পক্ষীপ্রেমী রবিকুমার ঝা বহু বছর ধরে এখানে পাখির ছবি তুলছেন, পাখি সংরক্ষণের চেষ্টাও করছেন। তা সত্ত্বেও এই জলাশয়ে প্রতি বছর পাখির সংখ্যা কমছে। রববাবুর মতে, পুকুরের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে এলাকাবাসীর পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনকেও এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে পুকুরটিকে আরও সাজিয়েগুছিয়ে তুলতে পারলে এলাকায় একটা নতুন পর্যটনকেন্দ্রও করা যাবে।

রসিকবিলের রসে মজে

আলিপুরদুয়ার থেকে রসিকবিল ৩৪ কিলোমিটার। আমাদের গাড়ি ছোটে কামাখ্যাগুড়ির দিকে। পথে অঢেল সবুজ। পথের ধারে ছোট ছোট কাঠের ঘর। কামাখ্যাগুড়ির অল্প কিছু আগে কামাখ্যানগর মোড় থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গাড়ি এগিয়ে যায়। এই রাস্তা সোজা গিয়েছে ভাতর-ভুটান

সীমান্তের কুমারগ্রাম। সেখান থেকে রাস্তা শেষ হয়েছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে। রসিকবিল আরও ৬ কিমি। দেখতে দেখতে বনপথের দুলুনি খেতে খেতে রসিকবিলে পৌঁছায় আমাদের গাড়ি। আলিপুরদুয়ার থেকে আসতে হলে বাসে কামাখ্যাগুড়ির কামাখ্যানগর মোড়ে নামতে হবে। সেখান থেকে কোচবিহার -রামপুরের বাসে রসিকবিল। তবে ট্রেনে সরাসরি আলিপুরদুয়ারে এসে গাড়ি ভাড়া করে রসিকবিল আসাই শ্রেয়। মাঝবিলের দ্বীপে, গাছে গাছে শামুকখোল। নীল আকাশের ক্যানভাসে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের নিচে বিশাল ডানা মেলে শামুকখোলেরা উড়ছে, চক্কর কাটছে, আবার ফিরে যাচ্ছে মগডালের বাসায়। পানকৌড়ির ব্যস্তসমস্ত ডুব এবং ভেসে উঠে চটপট ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিয়ে ফের ডুব দেওয়া, বকের পা টিপে টিপে চলা আর বিদ্যুৎ গতিতে ছোঁ মেরে মাছ ধরা অসাধারণ কাব্যিক সুষমা তৈরি করে। কোচরাজাদের এককালের মৃগয়াভূমি ১৭৫ হেক্টরের রসিকবিল ছাড়াও আশপাশে আছে আরও কতকগুলি জলাভূমি যেমন আটিয়ামোচর, নলডোবা, শালমারা, ভেড়াভেড়ি, নারারথলি ইত্যাদি। কোচবিহার বনদপ্তরের লাগোয়া বিটে রসিকবিল। পাশের বিট আটিয়ামোচড়। এই দুই অগভীর বনাঞ্চল এবং গোটাকয়েক জলাভূমিই এই অঞ্চলে দর্শনীয়। বর্ষার শেষে, শীতের মুখে দেশ-দেশান্তরের পরিযায়ী পাখিরা পাড়ি জমায় রসিকবিল আর তার আশপাশের অন্য সব বিলে। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই পাঁচ মাস থেকে বাচ্চা বড় করে ফিরে যায় তারা। প্রধান আকর্ষণ সাইবেরিয়ান ক্রেন। এছাড়াও যে কোনও সময়ে দেখা মেলে জলপিপি, পানকৌড়ি, শামুকখোল, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বেনে বউ, ফিঙে পাখিদের। সিজনে প্রায় ৮৮টি প্রজাতির পাখির দেখা মেলে এখানে।

পরিযায়ীর আবাসস্থল আলিপুরদুয়াব জুড়ে

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন রত্নেশ্বর ঝিল, চারমাইলের সাতবেকি ঝিল, নারারথলি ঝিল এবং রসিকবিলে 'হুইসলিং টিল' প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মেলার ফলে উৎসাহিত স্থানীয় প্রকৃতি এবং পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পক্ষী বিষয়ক সংগঠন। এক সময় গোটা আলিপুরদুয়ার শহরটি জলাশয় এবং জলাভূমি দিয়ে ঘেরা ছিল। পরবর্তীতে লাগাতার জবরদখলের ফলে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ জলাভূমিই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। একাধিক জলাভূমি, পুকুর ও ডোবা বুজিয়ে সেখানে একের পর অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলাব্যাপী সরকারি খাস জমির চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হবার ফলে জলাভূমি চিহ্নিত করে জবরদখলের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে জেলা প্রশাসন। জেলার বেশ কয়েকটি জলাভূমিকে চিহ্নিত করে সেখানে সরকারি নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে যে দ্রুত জলাভূমিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে, পরিযায়ী পাখির ঝাঁক আসাই তার প্রমাণ। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের চেয়ারম্যান অমল দত্তের মতে, শীতের মরশুমে তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রায় ১৪ রকম প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। এর মধ্যে হেরন, কমনটিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৪ বছর আগে আলিপুরদুয়ার শহরে আসা 'মাসফোভি ডাক' এসেছিল সুদূর আমেরিকা থেকে। আবার এতদিন বাদে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটার খবর পাওয়া যাচ্ছে। অমলবাবু মনে করেন, আগামী দিনে জেলা প্রশাসন শহরের জলাভূমি জবরদখল মুক্ত করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে প্রতি বছর শীতের মরশুমে আলিপুরদুয়ার শহর পরিযায়ীদের এক নতুন ডেস্টিনেশনে পরিণত হবে।

বৃক্ষরোপনের মতই 'পক্ষীরক্ষণ' চেতনা বাড়াতে হবে ছাত্রছাত্রী স্তরে

কিন্তু পাখিই যদি না থাকে বা না আসে তো যাবতীয় পর্যটনভাবনা স্বাভাবিকভাবেই শিকেয় উঠবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গেও আজ দ্রুত নগরায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলদূষণ। স্বভাবতই পাখিরা বিপন্ন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ যদিও শোনালেন, পাহাড় বা জঙ্গলের পাখি নিয়ে আশঙ্কা নেই কারণ এই ধরনের পাখি শিকার করা অসুবিধাজনক। কিন্তু সমস্যা পরিযায়ী পাখিদেরকে নিয়ে। পরিযায়ী পাখি শিকার করা হচ্ছে সেটা যেমন একটা কারণ, তেমনই তার চেয়েও বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ। জলাভূমির দূষণ

বার হেডেড গিজ

বাংলায় দাগী রাজহংস বলে পরিচিত এই প
বিবিসি-র সমীক্ষায় দেখা যায় এরা আসে

াখি আসে হিমালয়ের সর্বোচ্চ স্থান থেকে। ইমালয়ের ২৩০০০ ফুট উচ্চতা থেকে।

টাফটেড ডাক বাংলায় পরিচিত কালো হংস নামে।

একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এছাড়াও জল, শব্দ, বায়ু, রাসায়নিক দূষণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ পাখিকে বিরক্ত করছে। পিকনিক পার্টি তারস্বরে মাইক বাজাচ্ছে। পাখিরা ভয় পাচ্ছে। উজ্জ্বলবাবুর মতে, শিল্প দূষণ একটা অন্যতম ভয়ংকর ব্যধি যা সমাজকে এবং সভ্যতাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেয়। তাই পাখির অস্তিত্ব যে বিপন্ন একথা অস্বীকার করেননি উজ্জ্বলবাবু। তবে তাঁর মতে পাখির সংখ্যা কমছে একথা বললে ভুল হবে। উজ্জ্বলবাবুর মতে, পক্ষী সচেতনতার লক্ষ্যে বনদপ্তর নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করছে বনবস্তি, স্থানীয় মানুষ

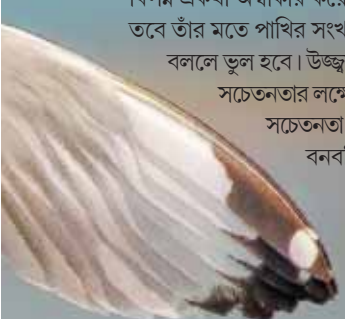

প্যালাস গাল

পলাশির গাংচিল নামে পরিচিত বড় চেহারার এই পাখিকে ব্ল্যাক হেডেড গাল-ও বলা হয়। প্রতিবছর গাজলডোবার জলাভূমিতে শীত পড়লেই আসে এই পাখি।

এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিকারবিরোধী, পাখি পাচার বিরোধী, কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা চলছে, পরিযায়ী পাখিরা যেখানে যেখানে আসছে সেই জায়গা ভিজিট করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাখিদের আবাসস্থলে মানুষের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পিকনিক পার্টিগুলি যাতে জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে পিকনিক করতে না পারে তার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। তাঁর মতে এর ফলে ফুলবাড়ি, গজলডোবাতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই পরিযায়ী পাখি শিকার বন্ধ করা গিয়েছে। প্রত্যেককে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করতে বলা হচ্ছে এবং তাতে ভালই কাজ হচ্ছে।

বনদপ্তর কাজ করছেন কিন্তু ফল মিলছে সাময়িক

বনমহোৎসব বা বন্য প্রাণ সপ্তাহ পালন হয় ইস্কুলে ইস্কুলে কিন্তু এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চেতনা জগে কতটুকু? পাখি নিয়ে আলাদা করে তো কিছু হয় না! অথচ যাদের কথা মাথায় রেখে এত দুশ্চিন্তা এত ভাবনা সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেই সংরক্ষণের কাজে লাগানো আশু প্রয়োজন, এতে চেতনা জাগবে অনেক ব্যাপক, দ্রুত এবং তা হবে দীর্ঘস্থায়ী। মতামত দিলেন জনৈক বর্ষীয়ান পক্ষীবিদ। তাঁর মতে উত্তরবঙ্গে অনেক ডাকসাইটে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যারা শহুরে বাচ্চাদের পাহাড়ে জঙ্গলে ক্যাম্প করাতে নিয়ে যায়। সেটা খারাপ নয় মোটেও, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের আগে সংরক্ষণ বেশি গুরুত্ব পেলে বোধহয় ভালো হত, তাই না? তবে হ্যাঁ, বন দপ্তরকেই জোগাতে হবে কিংবা ব্যবস্থা করে দিতে হবে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পরিকাঠামো, ফান্ডের জন্য অন্য দপ্তরের দরজায় ঘোরাঘুরি করার উৎসাহ বা সময় সবার নাও থাকতে পারে।

উজ্জ্বলবাবুর বক্তব্য, দেখুন আমার বা আমাদের একার ইচ্ছেয় তো সব সম্ভব নয়, তাই বন দপ্তর আপাতত কেবল নৈতিক সমর্থনটুকু দিতে পারে। যেখানে বালিহাঁস বা ডাহুক পাখি শিকার করা হচ্ছে সেই অঞ্চল পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে, সেখানে বনদপ্তরের নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া কোনও ভূমিকা নেই। তিনি মানলেন, এ সবের জন্য প্রয়োজন মাস্টার প্ল্যান, পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং উন্নয়নের সদিচ্ছা। দুটি মূল বিষয়ের ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হোক চান তিনি। এক, পরিবেশকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব বা 'প্রায়োরিটি' দিতে হবে। দুই বন, পরিবেশ, পর্যটন— এই তিন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়াতে হবে। তবেই রক্ষা পাবে পরিযায়ী পাখিরা, কারণ পাখিদের রক্ষা করাই হল প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের গোড়ার কথা। এই সহজ সত্যটিকে প্রত্যেকের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। তবেই সম্ভব হবে গোড়ার চার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তবেই সম্ভব ডুয়ার্সে দেশের বৃহত্তম পাখি-কেন্দ্রিক ইকো পর্যটন।

গৌতম চক্রবর্তী

ছবি: বিরূপাক্ষ মিত্র

ফুলবাড়ি ও গাজলডোবায় পাখিদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই!

পাখি নিয়ে পক্ষীপ্রেমিকদের উন্মাদনা প্রতিনিয়তই বাড়ছে, পাখির ছবি তোলা, পাখি নিয়ে ফিল্ম করার পাশাপাশি পাখি প্রজাতি চেনানোর লক্ষ্যে কাজ করছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এমনকি বনদপ্তরও বার্ড স্যাংচুয়ারি করার প্রকল্প প্রস্তাব পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু পাখি সংরক্ষণ নিয়ে কি সত্যি কিছু ভাবছে পক্ষীপ্রেমিক বা বিশেষজ্ঞরা? গত অক্টোবরের শেষে শিলিগুড়িতে একটি ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিশিষ্ট বন্যপ্রাণপ্রেমী সব্যসাচী চক্রবর্তী অভিযোগের সুরেই বলেছিলেন, ফুলবাড়িতে পাখি সংরক্ষণের কাজে গাফিলতির কথা। ফুলবাড়ি নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন আরও নানা মহল থেকে।

একজন সরকারি আমলা বিরূপাক্ষ মিত্র পক্ষীবিদ হিসেবেই জানালেন, ফুলবাড়িতে নির্বিচারে পাখি শিকারসহ অন্যান্য আরও অসামাজিক কাজকে প্রতিহত করে পাখি পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের বহুমুখী প্রকল্প তিনি বছর পাঁচেক আগেই ফাঁসিদেওয়ার বিডিও থাকাকালীন শুরু করেছিলেন। স্থানীয় মানুষজনকে সচেতন করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে পাশে নিয়ে শুরু হল স্থানীয় মানুষজনকে সচেতন করার কাজ। কীভাবে ফুলবাড়ির পরিবেশ রক্ষা করা যাবে, কীভাবে পরিযায়ী পাখি আরও বেশি সংখ্যায় আসবে, কীভাবে চোরাশিকার রোধ করা যাবে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং ফাঁসিদেওয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাহায্যে ব্যারেজের উত্তরদিক বা আপস্ট্রিমে অর্থাৎ যেদিকে পাখিরা আসে সেদিকে পিকনিক বন্ধের নির্দেশিকা জারি করতেই ধেয়ে এল প্রতিরোধ। ব্যারেজ লাগোয়া খাবারের দোকানে পিকনিকপ্রেমীদের ভিড় জমত বলে দোকানদারদেরই ছিল চরম আপত্তি।

বিরূপাক্ষ মিত্র

তাদের অনেক কষ্টে বোঝানো গিয়েছে প্রশাসন জায়গাটির সামগ্রিক উন্নয়ন চায়। চায় ফুলবাড়ি জলাভূমির নামটি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনতে। পর্যটনের প্রচার এবং প্রসার ঘটাতে পারলেই পুরো জায়গার চিত্রই বদলে যাবে, মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে। মানুষকে বোঝাতে, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তা সংস্কার, সাইকেল বিতরণ, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মাছের পোনা এবং মাছ রাখার জন্য হাইজিনিক ইনসুলেটেড বক্স বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা চোরাশিকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, জলদূষণ রোধের চেষ্টা করেন, চেষ্টা করেন পাখি ও পরিবেশ বাঁচাতে।

ফলস্বরূপ ছোট একটি উদাহরণ দিলেন তিনি। গল্পটি এইরূপ যে, ফুলবাড়ির বিডিও থাকাকালীন একদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় এক যুবক ফোন করে তাঁকে জানান হাইওয়ের পাশে ফুলবাড়ি ক্যানেলের কংক্রিটের ঢালে একটি বিশাল আকারের হিমালয়ান গ্রিফন বা শকুন আহত হয়ে পড়ে আছে, ওড়ার ক্ষমতা নেই। টর্চের আলোতে ভয় পেয়ে পালাতে পালাতে সেটি ক্যানেলের তীব্র স্রোতে ভেসে চলে যাবে। কিন্তু ঢালে নেমে শকুন ধরাও কম কথা নয়। অনেক ভেবে স্থানীয় এক জেলের মাছ ধরার জাল নিয়ে এসে অব্যর্থ লক্ষ্যে শকুন উদ্ধার হল। অন্ধকার রাতে ক্যানেলের ঢালে শকুনটি এমন বিপজ্জনক অবস্থায় যে জাল ছুঁড়তে সামান্যতম ভুল হলেই বিপদ ঘটে যাবে। পরে 'সুকনা ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ টিম' কে ডেকে শকুনটি তাদেরহাতে তুলে দেওয়া হল। মানুষকে কিছুটা হলেও যে সচেতন করা গিয়েছে এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

গাজলডোবা নিয়েও আশার কথা শোনা গেল বিরূপাক্ষের গলায়। তিস্তা ব্যারেজ ঘিরে সৃষ্ট বিশাল জলাশয় এবং চর এলাকাকে দেশি বিদেশি পরিযায়ী পাখিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বা বার্ড স্যাংচুয়ারি করার প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য রাজ্যের বনদপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত তার অনুমোদনও এসে গিয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু 'ভোরের আলো' প্রকল্পে স্বপ্নের মায়াজাল বোনার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তর 'মেগা টুরিজম পার্ক' গড়ার কাজ শুরু করেছে এবং প্রকল্প ক্রমশ অগ্রগতির দিকে। মোট ২০৮ হেক্টর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই পার্ক। হাই এন্ড লেক রিসর্ট হবে ১৫ একরে। তিন এবং চার তারা বিশিষ্ট হোটেল হবে ১০ একরে। ২টি বড় হোটেল ৬ একর জমিতে, আয়ুর্বেদিক স্পা ভিলেজ ৪ একরে, ওল্ড এজ হোম ৪ একরে। হসপিটালিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৫ একরে, ফুডকোর্ট, পিকনিক পার্ক এবং চিল্ড্রেন পার্ক ৮ একরে, রিসেপশন সেন্টার এবং বিশ্রাম কক্ষ ২ একর জমিতে, পার্কিং এরিয়া ৭.৫ একরে, কালচারাল জোন ১৫ একরে এবং বোট্যানিক্যাল গার্ডেন ১২ একরে। যদিও এখানে মেগা টুরিজম পার্ক তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক আছে। পরিবেশপ্রেমী এবং পক্ষীপ্রেমিকদের আশঙ্কা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং পাখিরাও ধীরে ধীরে এখানে আসা কমিয়ে দেবে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ মিত্রের মতে, মেগা পর্যটন হাব হলে পরিবেশের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন, প্রথমত, মেগা পর্যটন হাব গজলডোবার মূল জলাশয় যেখানে পাখিরা আসে সেখান থেকে অনেকটাই দূরে। দ্বিতীয়ত, সরকার যখন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন তখন পর্যটন, পরিবেশ, বন, সেচ, পরিবহণ সব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখেই কাজ শুরু করেছিলেন। তৃতীয়ত, পরিবেশ দপ্তর ছাড়পত্র না দেওয়ায় প্রকল্পের কাজই আটকে গিয়েছিল। সম্প্রতি পরিবেশ দপ্তরও ছাড় দিয়েছে প্রকল্পটিকে। পরিবেশগত আপত্তি থাকলে প্রকল্পের ভবিষ্যতই ঝুলে যেত। চতুর্থত, স্থানীয় মানুষ, যারা তিনমাস পাখির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন যেমন গজলডোবার মাঝিরা, তারা পেটে লাথি পড়ার সম্ভাবনা দেখলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করত। বিরূপাক্ষবাবু মনে করেন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই প্রকল্পের কাজ চলছে এবং এ নিয়ে ভয় পাবার কিছু আপাতত তিনি দেখছেন না।

এটা ঠিক সরকারি আধিকারিক হিসেবে বিরূপাক্ষ কখনই এমন কিছু বলবেন না যা সরকারের নীতি বা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু এটাও ঠিক যে আশার বাণী তিনি শোনালেন তা শুধু সুখকরই নয়, ডুয়ার্স তরাইয়ের জন্যও সুসংবাদ বইকি।

গৌ চ

মদনমোহন এবার অধিষ্ঠিত হলেন বুক পকেটে দুই মলাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বোধ করি বহুদিন বাদে এবার উত্তরের বইমেলা ময়দানগুলিতে হিমেল সন্ধ্যায় উষ্ণতা বয়ে আনছে নিজভূমির একের পর এক নক্ষত্রখচিত প্রকাশনা’। গোড়াতেই ডুয়ার্স হ্যাটট্রিক! ‘শ্রীমতি’ সাগরিকা রায়ের ‘ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো’ দিয়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন শুরু হয়েছিল বোধন, ২৩ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার বইমেলায় সাড়া পড়ে গেল দেবপ্রসাদ রায়ের ‘ডুয়ার্স থেকে দিল্লি’ এবং সেই সঙ্গে গৌতম চক্রবর্তীর ‘চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?’ এর যুগ্ম আবির্ভাবে। এই ত্রয়ীর সেই আলোড়ন অব্যাহত ছিল মালবাজারের বইমেলাতেও। সঙ্গে কোচবিহার বইমেলাতে আবার ধামাকা ‘এখন ডুয়ার্স’ প্রকাশনার। এবার আরেক ‘শ্রীমতি’-র পরিশ্রমী কলমে কোচবিহারবাসীর পরম আরাধ্য শ্রী শ্রী মদনমোহন দেব। মদনমোহন ও তাঁর মন্দির, জেলার অন্যতম প্রধান হেরিটেজ মদনমোহন বাড়ি নিয়ে এই প্রথম প্রকাশিত হল একটি প্রামাণ্য বই। উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় পর্যটন বলতেই যে নাম মুখে আসে সেই মদনমোহন ঠাকুর ও মদনমোহন বাড়ি নিয়ে তন্দ্রা চক্রবর্তী দাসের লেখা বই ‘প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন’ ৮ই জানুয়ারি কোচবিহার বইমেলা মঞ্চে প্রকাশ করলেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা সমাহর্তা কৌশিক সাহা। বলাই বাহুল্য, কোচবিহারের বইপ্রেমীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে তো বটেই, স্টলে অনেককেই দেখা গেছে কেবল এই বইটির কথা শুনেই বইমেলায় ঢুকেছেন। ‘এই উৎসাহ প্রত্যাশিত ছিল ঠিকই কিন্তু বইটি কিনতে অল্পবয়সীদের আগ্রহ চোখে পড়বার মত’, স্টলের ভিড় সামলে আপ্লুত লেখিকা জানালেন, ‘পরিকল্পনা হয়েছিল গত বইমেলার পর থেকেই, কিন্তু কাজ শুরু করেছিলাম আসলে গ্রীষ্ম বর্ষা পার করেই’। স্টলে সেসময় উপস্থিত এখন ডুয়ার্স পত্রিকার জনৈক পাঠক জানালেন, এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা অনস্বীকার্য। বইয়ের মুখবন্ধে বর্ষীয়ান কোচবিহার গবেষক-লেখক স্বপন কুমার রায় দাবিই করেছেন, ‘যে পরিশ্রম দিয়ে লেখক এই

ফুলবাহার

উপকরণ: ফুলকপি ৫০০ গ্রাম সাইজের একটা গোটা। সরষের তেল ৩/৪ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো স্বাদ মতো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা গোটা ৩/৪টি, মটরশুটি ১ কাপ, হিং এক চিমটে, কিশমিশ এক মুঠো, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ও গোটা জিরে ফোরণের জন্য। টম্যাটো পিউরি ৩/৪ চা চামচ, নুন ও চিনি স্বাদ মতো।

পদ্ধতি: গোটা ফুলকপিটি লবণ জলে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন যাতে কপির মধ্যে সারের কোনও গন্ধ না থাকে।

কড়াইতে প্রথমে সরষের তেল দিয়ে দিন, তেল গরম হলে তেজপাতা, জিরে ও হিং দিয়ে দিয়ে দিন। এরপর একে একে পেঁয়াজ বাটা, টম্যাটো পিউরি, আদা বাটা দিয়ে দিন। ২/৩ মিনিট পরে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ও মটরশুটি দিয়ে দিন ভালভাবে কষাতে থাকুন। এরপর কিশমিশ ও লবণ মিষ্টি দিয়ে দিন, কষানো মশলা থেকে যখন তেল ছাড়তে থাকবে তখন কড়াইটি নামিয়ে ফেলুন। প্রেশারকুকারে প্রথমে লবণ জলে ভেজানো ফুলকপিটি রাখুন, তার ওপরে কষানো মশলাটি দিয়ে ফুলকপিটিকে ভাল করে মশলা মাখিয়ে দিন এবং কড়াইধোয়া জল আধ কাপের মতো দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুকারের মুখ বন্ধ করে একটি হুইসেল দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ১০ মিনিট পর কুকারের ঢাকনা খুলুন ও গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। ঝোলটা একটু শুকিয়ে নিয়ে প্লেটে করে গরম গরম পরিবেশন করুন ভাত, পরোটা বা ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে। ফুলকপির অন্যরকম স্বাদ আপনার রসনাকে তৃপ্ত করবেই করবে।

ডুয়ার্সের ডিশ

শ্রাবণী চক্রবর্তী

মদনমোহন সংস্কৃতির নানান অধ্যায় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও নথিবদ্ধ করলেন ভবিষ্যতই তার যোগ্য সম্মান দেবে'।

১৭৬ পৃষ্ঠার পকেট আয়তনের এই বইটির ৪৮ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে মন্দির ও নানান প্রাচীন বিগ্রহের রঙীন ছবি। দাম ১১০ টাকা। বইটি পাওয়া যাবে মদনমোহন বাড়ির প্রবেশদ্বারের উল্টোদিকে অবস্থিত দেবত্র ট্রাস্টের বিপণিতে এবং উত্তরবঙ্গের নানা শহরের যে দোকানগুলিতে 'এখন ডুয়ার্স'-এর বইপত্র বিক্রি হয় সেখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশিত 'কোচবিহার' বইটির প্রথম প্রিন্ট এবার 'প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন' বেরোবার আগেই নিঃশেষিত। প্রকাশনা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণ খুব শীঘ্রই আসছে বাজারে। কলকাতা বইমেলা (৩১ জানুয়ারি-১১ ফেব্রুয়ারি) ছাড়াও এখনও বাকি রয়েছে ১৪-২০ ফেব্রুয়ারির জলপাইগুড়ি বইমেলা এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চের উত্তরবঙ্গ বইমেলা। সেসবের জন্য অপেক্ষা করছে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলনও। তবে আপাতত কোচবিহার শহরের মানুষ খুঁজছেন, কিনছেন, পড়ছেন এবং ভক্তিভরে তাকে তুলে রাখছেন 'প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন'।

শিবমন্দিরের অঞ্জসীর হাতে

শেরপাদের নিয়ে প্রথম গবেষণা

দার্জিলিং পাহাড়ের শেরপাদের নাম সর্বত্র রয়েছে। সেই শেরপাদের ওপর এই প্রথম ইতিহাসের আলোকে গবেষণার কাজ সারলেন শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

এভারেস্ট জয় করার জন্য তেনজিং নোরগে শেরপার নাম সবাই জানেন। এভারেস্ট বা অন্য পর্বত শৃঙ্গ জয় করতে যাওয়া অভিযাত্রীদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত বা সহযোগিতা করে থাকেন শেরপারা। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও শেরপারা অভিযাত্রীদের পাশে দাঁড়ান। ব্রিটিশরা দার্জিলিং পাহাড়ে রাস্তাঘাট নির্মাণের মতো কঠিন ও কঠোর পরিশ্রমের কাজে এক সময় শেরপাদের কুলির মতো ব্যবহার করেছে। কুলির মতো পরিশ্রম করিয়েও তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলে জানাচ্ছেন কিছু ইতিহাসবিদ। তাদের ছেলেমেয়েরা সঠিক চিকিৎসা ও শিক্ষা পায়নি। আজ আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিমালয় পাহাড়ের এই শেরপাদের জীবনযাত্রার ধারায় ব্যপক পরিবর্তন আসছে। তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তারি পড়ছে, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কেউ হয়েছে শিক্ষক। উত্তরবঙ্গের এই পাহাড়ি আদি জনজাতিদের নিয়ে তাই দেশের মধ্যে প্রথম ইতিহাসের আলোকে গবেষণার কাজ শেষ করে এমফিল করলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অঞ্জসী সরকার।

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে বাড়ি অঞ্জসীর। বাবা ড. ইচ্ছামুদ্দিন সরকার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাত্র ২৫ বছরের মেয়ে অঞ্জসী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এই প্রথম শেরপাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিহাসের ভিত্তিতে গবেষণা করলেন। ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দুই বছরের মধ্যে অঞ্জসী তার গবেষণা শেষ করেছেন। এর মধ্যে দেড়শ পৃষ্ঠার গবেষণা পত্র লিখতে তার টানা ছয় মাস সময় লেগেছে। এই কাজের জন্য তাকে বিশেষভাবে তিব্বতি ভাষা শিখতে হয়েছে।

তার গবেষণার বিষয়, দ্য হিমালয়ান পোর্টার —এ সোস্যাল হিস্ট্রি অফ দ্য শেরপা'স। আসছে ফেব্রুয়ারি মাসে এই নিয়ে দুশো পাতার বইও প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ-র কন্যা তথা দিল্লি

PACKAGE TOUR 2018

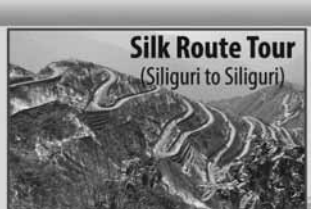

Date of journey 09/02/18, 28/02/18, 30/03/18, 13/04/18, 28/04/18, 04/05/18
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Date of journey 19/05/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

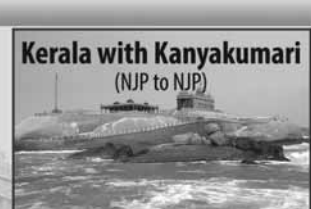

Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLIDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান উপেন্দার সিংহ এই কাজের প্রশংসা করেন। গবেষণা পত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের চিঠি ছাড়া নাঙ্গা পর্বতে শেরপাদের হাতে অর্পণ করা জার্মান রেড ক্রসের সার্টিফিকেট ঠাঁই পেয়েছে। জার্মান রেড ক্রসের সেই সার্টিফিকেটে অ্যাডলফ হিটলারের সই রয়েছে। রয়েছে শেরপাদের আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি।

কিন্তু কী আছে সেই গবেষণায়? জানা যাচ্ছে, পঞ্চদশ শতকে তিব্বত থেকে শেরপারা নেপালের শোলোখুম্বুতে বসবাস শুরু করেছিলেন। আর সেই সময় তারা নেপাল থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম আসা শুরু করেন ব্যবসার জন্য। দার্জিলিঙে বসবাসকারীদের জন্য তারা গরম পোশাকের উল ছাড়া বিভিন্ন খাদ্যের কাঁচা পণ্য নিয়ে এসে বিক্রি শুরু করেন। এই শেরপারা খুব পরিশ্রমী, সাহসী আর কোনও কাজে না করতে জানে না।

ব্রিটিশরা তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দার্জিলিঙের উন্নতির কাজে নামলেন। ১৮৮০ সালের আগেই দার্জিলিঙে রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। তখন তারা শেরপাদের পুরোদমে কাজে নামালেন। রেল লাইন পাতা থেকে শুরু করে পাহাড়ে কঠিন রাস্তা নির্মাণে শেরপাদের কাজে নামানো হল। শেরপারা বেশ স্বাধীনচেতা। তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সততার সঙ্গে দিনরাত পরিশ্রম করতে পিছপা ছিল না। একদিকে নিজের পায়ে দাঁড়ান অন্যদিকে কুলি পরিচয় থেকে সামাজিক মর্যাদা আনতে পরিশ্রম করলেও তারা ক্রমশ ব্রিটিশদের কাছে প্রভু-ভৃত্যের জায়গায় পৌঁছাতে লাগলেন। যেখানে যে কাজে দুইজন শ্রমিক প্রয়োজন সেখানে একজনকে দিয়ে কাজ করানো হতে লাগল। এর মধ্যেই ১৮৬০ সাল থেকেই দার্জিলিঙের হাওয়ায় চা-বাগানের বিস্তৃতি ঘটতে লাগল। সেখানেও প্রথম দিকে শেরপাদের কাজে লাগানো শুরু হল। কিন্তু চা-বাগানে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে লাগল। এর ফলে অনেক শেরপা কাজ ছেড়ে চলে যেত সহজেই। তখন বাইরে থেকে, বিশেষ করে বিহার থেকে চা-বাগানের কাজে মদেশীয়দের আনা শুরু হল। এতে শেরপাদের কাজে ভালই ধাক্কা লাগল। কিন্তু তারা দমে যেতে চায়নি। তারা লড়াকু। ব্রিটিশরা অনেক শেরপাকে সেনাবাহিনীতেও নিয়োগ করতে শুরু করল। তারা পাহাড়ে চড়ার সময় একটা কাজ আর কুলি হিসাবে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সময়ের ভাগ করে নিল। অপর দিকে তিব্বত থেকে তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল।

অঞ্জসীর এই গবেষণা ও বই প্রকাশের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড় থেকে শেরপারা শিবমন্দিরে অঞ্জসীর বাড়িতে দেখা করতে আসছেন। তারা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তারা বলছেন, এই প্রথম তাদের

> পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরা দাবি করে থাকেন ব্রিটিশরা এসে শেরপাদের সভ্য করে তুলেছেন, শিক্ষিত করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসবিদরা দাবি করছেন, ব্রিটিশরা শেরপাদের সভ্য বা শিক্ষিত করেনি। শেরপাদের মধ্যে আগে থেকেই সভ্যতা ছিল। অঞ্জসীও ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ওপর কেউ গবেষণামূলক কাজ করলেন।

২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী দার্জিলিং জেলায় শেরপাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার আর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার গোটা রাজ্যে। তাদের মধ্যে প্রথম তেনজিং নোরগে ১৯৫৩ সালে এডমন্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ করে দেশের সম্মান সেই সঙ্গে বিশ্বের দরবারে শেরপাদের স্বীকৃতি নিয়ে এলেন। এরপর ১৯৫৪ সালে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট তৈরি হলে সেখানে প্রথম ইন্সট্রাক্টর হিসাবে ছয় জন শেরপার স্থান হল। যারা তাদেরকে কুলি হিসাবেই বেশি পরিচয় দিয়ে এসেছে সেই ব্রিটিশদের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে তারা সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে বেশ এগিয়ে যেতে থাকল। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বিভিন্ন স্থানে চাকরি করছে। যদিও গবেষক অঞ্জসীর কথায়, ওদের উচ্চশিক্ষার হার এখন মাত্র ৩ শতাংশ। আর ওদের কাজের কিছু কিছু এখন নিজস্ব ব্র্যান্ডিং পাওয়া শুরু করেছে। যেমন শেরপা বুট, শেরপা সোয়েটার।

শেরপা মানে হল পূর্ব দেশের অধিবাসী। তারা একটি উপজাতি। তাদের প্রধান খাদ্য আলু। তার সঙ্গে দুধ, ঘি, মাখন রয়েছে। অনেকে ইয়াক ও মুরগির মাংস খেয়ে থাকে। পাহাড়ে ওঠার জন্য তারা রান্না করা মাংস নিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকেন। শীতের আবহাওয়ায় তা অনেক দিন ভাল থাকে। তারা ছাগল ও ভেড়া পোষার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াক পোষে। এদের লোম থেকে গরম পোশাক তারা তৈরি করে। অনেক শেরপা আবার হাতে একটু পয়সা এলে গুম্ফা তৈরি করছে। তারা মনে করছে বৌদ্ধ গুম্ফা তৈরি করে সামাজিক গুরুত্ব বাড়বে। অনেকেই আজ ট্রাভেল ব্যবসা শুরু করছে। কুলি শব্দের পরিবর্তনের জন্য তারা এভাবেই লড়ছে।

শেরপাদের পোশাকে চলে এসেছে জিনস, আধুনিকতা। গবেষখ অঞ্জসী এইসব বিভিন্ন দিক মেলে ধরে পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ আর ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে শেরপাদের মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার কথায়, পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরা দাবি করে থাকেন ব্রিটিশরা এসে শেরপাদের সভ্য করে তুলেছেন, শিক্ষিত করেছেন। পাশাপাশি ভারতীয় ইতিহাসবিদরা দাবি করছেন, ব্রিটিশরা শেরপাদের সভ্য বা শিক্ষিত করেনি। শেরপাদের মধ্যে আগে থেকেই সভ্যতা ছিল। বুদ্ধের ভাব, অহিংস মনোভাব তাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। অঞ্জসীও ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার প্রশ্ন, ব্রিটিশরা যদি তাদের শিক্ষিত করে তুলবেন তবে কেন দুইজন শ্রমিকের কাজ একজনকে দিয়ে করানো হত? প্রাপ্য মজুরি না পেয়ে শেরপারা টাকার অভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিশনারিতে ভর্তি করতে পারেনি। তাদেরকে কুলি বলে অনেক স্থানেই ইংরেজরা পরিচয় দিত, কিন্তু কারও পোশাক, চলাফেরা, কোন ভাষায় সে কথা বলে সেটা আধুনিকতা আনে না। কারও চিন্তা শক্তিতে যদি আধুনিকতা থাকে তবে সেটা তাদেরকে সৃজনমূলক কাজে এগিয়ে দিতে পারে। শেরপারা অসভ্য ছিল, আমরা এসে ওদের সভ্য করেছি— সাহেবদের এই দাবি সঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেছেন অঞ্জসী।

বাপি ঘোষ

বেলাকোবার চমচম

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার চমচমের একটা বহুদিনের ঐতিহ্য রয়েছে। বেলাকোবার চমচমের নাম গোটা বাংলা তো বটেই এমনকি বিদেশেও রয়েছে। এখন তাই রসগোল্লার সরকারি স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার চমচমের সরকারি স্বীকৃতির দাবি উঠল। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বরর রায় বলেছেন, বেলাকোবার চমচমের স্বীকৃতির জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের একটি দল কিছুদিন আগে বেলাকোবা ঘুরে গিয়ে চমচমের কিছু নমুনা নিয়ে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা একটি গ্রাম শহর। সেই গ্রামের চমচমের নাম সবার মুখে মুখে ফেরে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়া কলকাতা থেকেও পর্যটকরা বেলাকোবা এলে সেখানকার চমচম কিনে নিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় চমচম ব্যবসায়ী বোধন দত্ত বলেন, তাদের বেলাকোবার চমচম বিশেষ অর্ডার দিয়ে আমেরিকা ও লন্ডনেও নিয়ে গিয়েছেন অনেকে।

বেলাকোবার চমচমের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল থেকে দুই বন্ধু কালিদাস দত্ত এবং ধীরেন সরকার বেলাকোবা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচমের খ্যাতি জগত জোড়া। সেখানকার চমচম জিভে জল আনে। বেলাকোবার লোকজন বলেন, সেই দুই বন্ধু টাঙ্গাইল থেকে চমচম তৈরি করা শিখে আসেন। তারা তাই দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেলাকোবায় চমচম তৈরির কাজ শুরু করেন। তারা প্রথমে সেই চমচম তৈরি করে চা-বাগানে ফেরি করে বেড়াতেন। ধীরে ধীরে এর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই দুই বন্ধু কালিদাস দত্ত বা ধীরেন সরকার আজ বেঁচে নেই। তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বোধন দত্ত বা উদয় দে সরকাররা আজও সেই ঐতিহ্যের ধারা ধরে রেখেছেন।

এই চমচম আসলে ছানার তৈরি। তার সঙ্গে দুধ, চিনি, সামান্য ময়দা ব্যবহার হয়। বেলাকোবার চমচমের বিশেষত্ব হল, এই চমচমে কড়া পাকের মিষ্টির সঙ্গে ওপর দিয়ে ক্ষীর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চমচমের ভিতরটা রসাল ও নরম। একটু লালচে ধরনের চমচম। একসময় ৫০ পয়সা বা এক টাকাতেও পাওয়া যেত। আজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর দামের অনেক হেরফের হয়েছে। প্রয়াত কালিদাস দত্তের ছেলে বোধন দত্ত জানালেন, তার কাছে এখন কুড়ি টাকা ও দশ টাকা দামের চমচম পাওয়া যায়। তিনি তার বাবার কাছ থেকে এই চমচম তৈরির

“এই চমচম আসলে ছানার তৈরি। তার সঙ্গে দুধ, চিনি, সামান্য ময়দা ব্যবহার হয়। বেলাকোবার চমচমের বিশেষত্ব হল, এই চমচমে কড়া পাকের মিষ্টির সঙ্গে ওপর দিয়ে ক্ষীর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চমচমের ভিতরটা রসাল ও নরম। একটু লালচে ধরনের চমচম। একসময় ৫০ পয়সা বা এক টাকাতেও পাওয়া যেত।”

কাজ শিখেছেন। তবে লালচে ভাবের চমচমের সঙ্গে তারা সাদা চমচমও তৈরি করেন। কুড়ি টাকা দামের চমচমের আকার লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, তার ওজন ১২০ গ্রাম। আর দশ টাকা দামের চমচমের ওজন ৫০ গ্রাম, তা লম্বায় তিন ইঞ্চি। দুই কেজি ওজনের ছানার সঙ্গে ৫০ গ্রাম ময়দা দিয়ে যে চমচম বের হতে পারে তাতে ১১০টি দশ টাকা দামের চমচম বের হয়। আর কুড়ি টাকা দামের চমচম বড় হতে পারে ৫০টি। তারা খাঁটি গরুর দুধ ব্যবহার করেন। কুড়ি টাকা দামের চমচমের ভিতরে কিছু মৌচাকের মতো কড়া মিষ্টি থাকে। দিনে বোধনবাবু ৩০০র বেশি চমচম তৈরি করেন। তবে কেউ অর্ডার দিলে ত্রিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা দামেরও চমচম তৈরি করেন। কালিদাস দত্ত বা ধীরেন সরকারের ছেলেরা ছাড়া প্রতুল পাল, গোপাল রাহাসহ মোট সাত জন এখন বেলাকোবায় এই চমচম তৈরি করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস মিত্র বলেন, তাদের কাছে গর্ব এই চমচম। প্রশাসনের লোকজনও বিশেষ অর্ডার দিয়ে এখান থেকে চমচম নিয়ে যান। স্থানীয় মহিলা ইলা সেন জানান, তার বাপের বাড়ি বেলাকোবায়। তিনি বাপের বাড়ি এলেই শ্বশুড় বাড়ি মালদায় ফেরার সময় এই চমচম নিয়ে যান। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিখিল দে জানান, আগের স্বাদের সঙ্গে এই চমচমের স্বাদে কিছুটা ফারাক তৈরি হয়েছে। আগে জিভে দিলেই এই চমচম মুখে গলে যেত। এখন মনে হয় যেন একটু ফ্যাট ভাব রয়েছে।

এত সব সত্ত্বেও এই চমচম আমেরিকা, লন্ডন ছাড়া ব্যাংকক যাচ্ছে। এখন রসগোল্লার স্বীকৃতির সঙ্গে এই চমচমকে সরকারি স্বীকৃতি দিলে এই চমচম নির্মাতারা তারে চমচমের গুণগত মান আরও বাড়াতে পারেন। তাছাড়া এর থেকে বিদেশি মুদ্রাও আসতে পারে। রাজ্য সরকার গাজোলডোবায় বিরাট পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করছে। বেলাকোবার পাশেই গাজোলডোবা। বেলাকোবা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে শিকারপুর চা-বাগানে ঐতিহাসিক ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মন্দির। আবার বেলাকোবা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে সতীর একান্ন পিঠের একটি মা ভ্রামরী দেবীর মন্দির। সেইসব স্থানে পর্যটকরা এলে বেলাকোবা প্রবেশের সময় সেখানকার চমচমের খোঁজ করেন। জলপাইগুড়ির গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, ব্রিটিশের সময় থেকে বেলাকোবায় চমচম তৈরি হয়ে আসছে। আজ এর ব্র্যান্ডিং দরকার। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, রসগোল্লার মতো বেলাকোবার চমচম যাতে সরকারি স্বীকৃতি পায় সেজন্য তারা রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়ে আবেদন করেছেন।

বাপি ঘোষ

ডুয়ার্স থেকে শুরু

Big জ্ঞান, বিজ্ঞান

এমন কি কোনও বিশেষ অঙ্ক আছে, যার ইকুয়েশন মেলাতে পারে একমাত্র হীরের টুকরো ছেলেরাই? কেরিয়ারের ক্ষেত্রেই বা কেন সবাই শুধু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এমবিএ হবে বলে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে? কেউ কেউ তো অন্তত আবিষ্কারের নেশায় বিজ্ঞানী হওয়ার কথা ভাবতে পারে? বিজ্ঞাপন জগতের চাকরি সূত্রে দু দু'বার বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল লেখকের। কিন্তু তার আগে নিজের ছাত্র জীবনে, বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে গিয়ে, ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। তাই এই যোগাযোগকে কতদূর মণিকাঞ্চন যোগ বলা যায়, আজকের পর্ব পরোক্ষে তারই খতিয়ান!

—কে বলেছে মঙ্গল অভিযান অসম্ভব? যে বলেছে, সে একটি আস্ত মূর্খ!

—আরে রাখ তোর মঙ্গল! সেই কবে একবার চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে মানুষ... দ্বিতীয়বার যেতে পারল তারপর, এত বছরে? মহাকাশ অভিযানে খরচটাও আসলে মহাকাশ ছোঁয়, বুঝলি!

—সেই জন্যই তো বলছি, চাঁদের মতো একটা নিরেট পাথরের পিণ্ডে গিয়ে কোনও লাভ নেই। বরং সে তুলনায়, মঙ্গল গ্রহে যা ন্যাচারাল রিসোর্স আছে...

—...গিয়ে পৌঁছলে সবাই একদম লালে লাল হয়ে যাবে তা পেয়ে, তাই না? চল তবে দঙ্গল বেঁধে সবাই মঙ্গল রওনা হয়ে যাই!

উচ্চগ্রামে চলছিল আমাদের তুমুল তপ্ত তর্ক। খোলা ছাদে... চাঁদের শীতল ছায়ার নিচে বসে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে সেটা ছিল পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের দিন। আমরা জনা ছয়েক জলপাইগুড়ির ছেলে মেস করে থাকি তখন কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর সন্তোষপুরে। সরু গলিতে একপাশে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ও অধ্যাপকদের কো-অপারেটিভের অতি স্বাস্থ্যবান চালতলা বিল্ডিং। আর তার উল্টোদিকে এক লিকপিকে রোগা তিনতলা বাড়ির ছাদে, একদিকে অ্যাসবেস্টস-এর ছাউনির নিচে আমাদের মেসের দুটো ঘর। বাকি অর্ধেক খোলা ছাদটা আমাদের নিত্য সন্ধ্যার উন্মুক্ত আড্ডাস্থল।

সেদিন অবশ্য সূর্যগ্রহণ দর্শন উপলক্ষে সাত সকাল থেকেই আমরা ছাদে জড়ো হয়ে গ্যাঁজাচ্ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বল্টু তখন চাকরি করতপাহাড়পুর কুলিং টাওয়ারে। ফ্যাক্টরি থেকে সে কয়েক টুকরো পুরু মোটা কালো কাচ যোগাড় করে এনেছিল। আমরা সবাই হাতে হাতে তাই নিয়ে প্রস্তুত, চাঁদের ছায়ার আড়ালে সূর্যের হিরের আংটিসম রূপ দেখব বলে। অবশ্য কলকাতা অবধি তখনও সে ছায়া পুরোপুরি এসে পৌঁছয়নি। দিনের আলোতে ধীরে ধীরে সন্ধের ছাই রং ধরছে সবে। ঘরের ভেতরে এক একবার গিয়ে টিভির ছবিতে দেখে আসছি... আফগানিস্থান পেরিয়ে গ্রহণ এই সবে রাজস্থানে পৌঁছাল... এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পূর্ব ভারতের দিকে। অপেক্ষার সেই প্রহর আর কাটে না দেখেই, এক সময় মহাকাশ অভিযান

নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু এবারে, আলো যত অপার্থিব হয়ে উঠছে, আপনা থেকেই সবার কথা থেমে স্তব্ধতা ঘন হয়ে উঠতে লাগল। যতই হোক, একটা মহাজাগতিক ব্যাপার তো! আমাদের স্বভাবগত ফক্কুড়ি আর চপলতাও তাকে অস্বীকার করতে পারে না। সামনের চারতলা বাড়িটি ছাড়া চারপাশে তেমন কোনও বাধা নেই। ফলে ঘিঞ্জি জনবসতির ওপর দিয়ে কালো ছায়াটির সরে আসা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। একটা জবরদস্ত সুপার ন্যাচরাল ফিলিং হতে লাগল সত্যিই। সূর্য যেভাবে ঢেকে যাচ্ছে, তাতে না চাইলেও একটা আদিম ভয় কোত্থেকে এসে যেন গ্রাস করছে আমার মনকে। এই সূর্য যদি ঝপ করে চিরতরে নিভে যায়, শীতল মহাশূন্যে আমাদের গ্রহখানার কী দশা হতে পারে, পলকের জন্য আমি সেই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে শিউরে উঠলাম। সম্বিত ফিরল, চারপাশে মানুষের হৈ চৈ আর সিটি বাজানো শুনে। আকাশে তখন হীরের আংটি ফুটে উঠেছে! আর তাতে বাহবা জানাতেই এত সোরগোল।

জীবনে ওই একবারই স্বচক্ষে অতি স্পষ্ট সেই হীরের আংটি দেখা। এবং সেই সৌন্দর্য-র তারিফ না করে পারা যায় না।

তবে, তার আগে অবধি হীরে জিনিসটাকে আমি কিন্তু বরাবরই এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেছি একটি বিশেষ কারণে। হায়ার সেকেন্ডারিতে

“আমি বুঝতে পারলাম যে জীবনে এই একটিবারই আমি হয়ত এই হীরের অঙ্কটির ঠিকঠাক ফয়সলা করতে পারব। যদি ফার্স্ট বয়ের খাতা দেখে, পুরো ইকুয়েশনটি নিজের খাতায় হুবহু এঁকে ফেলতে পারি। কিন্তু এত ভাল একটি সম্ভাবনায় পূর্ণগ্রাস গ্রহণ লেগে গেল পূর্ব উল্লেখিত ফার্স্ট বয়-টির নার্ভাসনেসের জন্য।”

বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গিয়ে জঘন্য খারাপ রেজাল্ট হয়েছিল আমার। তার জন্য কেমিস্ট্রি আর অঙ্কের ক্যালকুলাস, এই মানিকজোড়কে দায়ী করতে হয়। অতি জটিল সব ফর্মুলা আর সমীকরণের ধাঁধাতে এরা দু'বছর ধরে আমার একেবারে নাজেহাল দশা করে ছেড়েছিল। যাকে বলে, টোটাল লাইফ হেল! জীবনে আর কোনও বিষয়ে দাঁত ফোটাতে আমি এত সাফল্যের সাথে কখনও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আবছা আবছা মনে পড়ে, কী যেন একটা অঙ্ক ছিল... যেখানে একটি হীরে ভেঙে অনেক টুকরো হয়ে যেত এবং ক্যালকুলাসে হিসেব করে সেই টুকরোগুলোর ক্রমহ্রাসমান মূল্য বার করতে হত। আমার পক্ষে ওই অঙ্ককে কব্জা করা তো দুরাশা। আরও ভাল করে বলতে গেলে, দুরাশা... টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি! খালি মনে হত, এই অঙ্কের সমাধান যারা করতে পারে, তাদেরকেই বোধহয় হীরের টুকরো ছেলে বলে!

আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, এইচএস পরীক্ষাতে ওই হীরের অঙ্কটিই এল, আর পরীক্ষার হলে আমার পাশের সিটে আমি পেয়ে গেলাম একটি হীরের টুকরো ছেলেকেই! ফণীন্দ্রদেব ইন্সটিটিউশনে একসঙ্গে সিট পড়েছিল আমাদের সোনাউল্লা স্কুল আর জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের। আর পড়বি তো পড়, একদম আমার পাশের সিটেই, জেলা স্কুলের ফার্স্ট বয়। আমি বুঝতে পারলাম যে জীবনে এই একটিবারই আমি হয়ত এই হীরের অঙ্কটির ঠিকঠাক ফয়সলা করতে পারব। যদি ফার্স্ট বয়ের খাতা দেখে, পুরো ইকুয়েশনটি নিজের খাতায় হুবহু এঁকে ফেলতে পারি। কিন্তু এত ভাল একটি সম্ভাবনায় পূর্ণগ্রাস গ্রহণ লেগে গেল পূর্ব উল্লেখিত ফার্স্ট বয়-টির নার্ভাসনেসের জন্য। উটের মতো গলা বাড়িয়ে আমি দু'-তিনবার উঁকি মেরে সবে অঙ্কের প্রথম লাইন

কপি করেছি... ফার্স্ট বয় হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। এবং নাঁকি সুরে আমায় বলল, স্যার যদি দেখে ফেলে... আর আমার খাতা কেড়ে নেয়, কী হবে? ভয়ে আমার মাথা কাজ করছে না... আমার কিন্তু অঙ্কে ভুল হয়ে যাবে!

আমি তখন, তার রকম সকম দেখে ভাবলাম, ধুর ছাই! মেহনৎ করে অন্যের ভুল অঙ্ক টুকে কী লাভ? ওইটুকু ভুল তো আমি নিজেই স্বচ্ছন্দে করতে পারি। চুলোয় যাক হীরের দাম!

যাই হোক, সূর্য গ্রহণের হীরের আংটির অপরূপ চেহারা দেখে অবশেষে বহু বছর বাদে হীরের সঙ্গে আমার সেই পুরানো ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। ওই একই রকম মাত্রার আর একটি মহাজাগতিক দৃশ্য এরপর আমি আবার দেখি আট বছর বাদে। ভোরের বাস ধরে বর্ষার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আসছি। আকাশে খুব নিচ দিয়ে উড়ে চলেছে পাতলা মেঘের স্তর। জানালার ধারে দিগন্ত অবধি ঝাপসা হয়ে আছে তার প্রভাবে। আর সেই আস্তরণের ভেতর থেকে উঁকি দেয়া সূর্য তেমন চোখ ঝলসানো তীব্র নয় বলেই, এক অসাধারণ দৃশ্য দেখা সম্ভব হল। সৌর কলঙ্ক বা সান স্পট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সূর্যের শরীরে ফাটলের মতো সরু ও কালো, আঁকাবাঁকা একটি দাগ। পরে পত্রপত্রিকায় পড়েছি, সেটা ছিল প্রায় এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হওয়া অনেকগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র। বাস্তবে সেগুলো সবই উজ্জ্বল আলোর সমাহার। কিন্তু বাকি সূর্য পৃষ্ঠের তাপ আর উজ্জ্বলতার তুলনায় তা বহুগুণ কম বলে, আমাদের মানব চক্ষুতে ওটা নিছক কালো দাগ হিসেবে ধরা দেয়।

এই হল মহাজগতের আশ্চর্য বিস্ময়। আমরা চর্মচক্ষুতে যা দেখতে অভ্যস্ত, তার বাইরে এ এক অপার রহস্যের জগত। বলতে গেলে, যার গভীরতা মাপার মতো কোনও মানদণ্ডই নেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। মানুষের কোনও শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনকেই আদতে হয়ত তার সমকক্ষ বলে গণ্য করা যায় না। ব্যতিক্রম ধরতে গেলে একমাত্র শিল্প সৃষ্টিই হয়ত তার বিপুলতার (খানিকটা অন্তত) সার্থক প্রতিফলন। মানে, উদাহরণ হিসেবে যদি ধরি রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সৃষ্টি কর্ম। কোনও মানুষের পক্ষে এক জীবনে তার পুরোটা আস্বাদন বা অনুধাবন করা সম্ভব কি? গোদা ভাষায়, মহাশূন্যের রকমসকমও কিছুটা সেরকম।

হায়ার সেকেন্ডারির পর আমি সায়েন্সের দিক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম কক্ষচ্যুত উল্কার মতো। কিন্তু সায়েন্সে ইন্টারেস্ট বজায় রয়ে গেল মূলত সায়েন্স ফিকশন গল্প পড়ার নেশার কারণে। যেটা অতি ছোট বয়সে শুরু হয়েছিল ফ্ল্যাশ গরডনের কমিক্স দিয়ে। তারপর ক্রমে জুলে ভারনে, সত্যজিৎ রায়, জয়ন্তবিষ্ণু নারলিরকার, অদ্রীশ বর্ধন হয়ে আর্থার সি ক্লার্ক ও আইজ্যাক আজিমফ অবধি গড়িয়েছিল। এছাড়া ছিল নাসার অফিশিয়াল আর্টিস্ট রবার্ট টি ম্যাককাল-এর দুর্দান্ত স্পেস ইলাস্ট্রেশনগুলোর আকর্ষণ। কিংবা দীপ্তি সিনেমা হলে দেখা জেমস ক্যামরনের 'অ্যালিয়েন্স', স্পিলবার্গের 'ই-টি'... ইত্যাদি। এরপর ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে শিলিগুড়ির ফুটপাথ থেকে একদিন কিনলাম স্টিফেন হকিং-এর 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। যেটা বুঁদ হয়ে পড়তে পড়তে জানলাম যে গল্প এবং কল্প বিজ্ঞানের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় আসল মহাশূন্যের রহস্য।

কেরিয়ার স্টাডিতে যদিও বিজ্ঞান থেকে ইস্তফা দিলাম, কিন্তু বিজ্ঞাপনে হল আমার কর্মজীবন শুরু। আর দু'জগতের মধ্যে প্রথম

"বিজ্ঞাপনের কাজে আমার প্রথম ক্লায়েন্ট ছিল ডোভার লেনে অবস্থিত একটি সংস্থা, যারা নিম তেল থেকে মশা তাড়ানোর ওষুধ বানানোর কাজ করছিলেন। এছাড়াও ওদের আর একটি প্রোডাক্ট ছিল। নিম তেল দিয়ে বানানো ফিনাইল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যে প্রক্রিয়ার পোশাকি নাম 'প্রোডাক্ট লঞ্চ ক্যাম্পেন', সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।"

দু' অক্ষরের এই মিলটা আরেকটু প্রসারিত হল যখন কর্মসূত্রে সুযোগ হল পেশাদার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ করার। পেশাদার শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার আগে অবধি আমার একটা সরল ধারণা ছিল যে বিজ্ঞানী মাত্রেই কোনও নতুন তত্ত্ব বা সত্য প্রমাণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত একজন আত্মভোলা মানুষ। আজকের বাণিজ্যিকরণের দিনে, তাদের চেষ্টার পেছনে যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও থাকবে, এটা আমার মাথায় খেলেনি। এই মানসিকতার কথা শুনে পাঠক বুঝতেই পারছেন, শুরুর দিকে বিজ্ঞাপন ব্যাপারটি সম্বন্ধেও আমি কত আনাড়ি ছিলাম!

বিজ্ঞাপনের কাজে আমার প্রথম ক্লায়েন্ট ছিল ডোভার লেনে অবস্থিত একটি সংস্থা, যারা নিম তেল থেকে মশা তাড়ানোর ওষুধ বানানোর কাজ করছিলেন। এছাড়াও ওদের আর একটি প্রোডাক্ট ছিল। নিম তেল দিয়ে বানানো ফিনাইল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যে প্রক্রিয়ার পোশাকি নাম 'প্রোডাক্ট লঞ্চ ক্যাম্পেন', সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আজকাল ওই ব্র্যান্ডটির বাজারে বেশ নাম হয়েছে। আর আমার ভাবতে ভাল লাগে, যে তাদের সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনটি আমারই মস্তিষ্ক প্রসূত। সত্যি বলতে কি, আমার নিজের জীবনেও ওটাই ছিল প্রথম তৈরি করা বিজ্ঞাপন।

প্রথমদিন যখন মিটিং করার জন্য একা একা যাচ্ছি সেই অফিসে, তখন কলকাতার প্রায় কিছুই চিনি না। তবে, ডোভার লেন নামটি আগে থাকতেই জানা ছিল। কারণ ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের কথা খবরের কাগজে বহুবার পড়েছি জলপাইগুড়ি থাকতেই। গড়িয়াহাট থানার সামনে বাস থেকে নেমে যখন পদার্পণ করলাম সেই ডোভার লেনে, মনে মনে একটা আশা ছিল যে কোনও বাড়ির জানালা দিয়ে হয়ত উচ্চস্বরে শাস্ত্রীয় সংগীতের তান আলাপ শুনতে পাব। মানে, এক্ষেত্রেও সরল মনে ধরে নিয়েছিলাম যে ডোভার লেনেই বোধহয় ম্যারাপ ট্যারাপ বেঁধে প্রতি বছর এই সংগীত সম্মেলন হয়। অনেক পরে জেনেছি, যে এই সংগীত সম্মেলন আদৌ ডোভার লেনে হয় না আজকাল। ফলে, বাস্তবে সেদিন ডোভার লেনে, ক্ষণে ক্ষণে গাড়ির বেসুর হর্ন ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। তবে এটা মানতেই হবে, যে সম্ভ্রান্ত সেই গলির পরিবেশ। চারদিকে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি। রাস্তায় পথচলতি মানুষেরও তেমন ভিড়ভাট্টা নেই। কিছুদূরে এগিয়ে যখন বাসন্তী দেবী কলেজের কাছের ক্রসিঙে পৌঁছালাম, কানে এল অজস্র পাখিদের কলকাকলি। সেখানে বাঁক ঘুরে আরেকটি গলিতে উঁকি দিতেই আবিষ্কার করলাম, পথের ধারে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাট আকারের জাল দেওয়া খাঁচায় প্রায় শতখানেক রংবেরঙের পাখি কিচমিচ করছে। উঁচু উঁচু বাড়ির মাঝে ছায়াচ্ছন্ন সেই গলিতে বিকেলের একফালি রোদ কী করে যেন ফাঁক গলে চলে এসে, আলোকিত করে রেখেছে খাঁচার একটি অংশ। আর খাঁচার ছোট্ট পরিসরেও ইতিউতি উড়তে থাকা পাখিদের ডানা ঝলসে উঠছে সেই আলোর আওতায় এসে। তাই দেখে মনে মনে আমি নোট করে ডোভার লেন মানে তাহলে, পাখিদের গলিও!

খুঁজে খুঁজে এরপর একসময় পৌঁছলাম আমার ক্লায়েন্টের অফিসে। একটি ছোট্ট অগোছালো ঘরে কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজারের সামনে বসে আছি। তিনি ডেকে পাঠালেন তার সেলস টিমের প্রধানকে। ঘরে এসে ঢুকল আমারই বয়সী একটি ছেলে। আর তাকে দেখে আমি চমকে উঠে ভাবলাম, আরে... এ তো সেই ডাকাত দলের সর্দারটি! তখন দূরদর্শনে ধারাবাহিকভাবে চলছিল শীর্ষেন্দু

মুখোপাধ্যায়ের 'নবীগঞ্জের দৈত্য'। আর আগের শনিবারের পর্ব-তেই আমি এই ছেলেটিকে সেখানে অভিনয় করতে দেখেছি।

জানলাম, ওর নাম রূপম। এবং কয়েকদিনের মধ্যে বেশ দোস্তিও হয়ে গেল তার সাথে। সেই সূত্রেই আরও জানা গেল, যে ওর কাকা এবং কাকিমা দু'জনেই সায়েন্টিস্ট। এই কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো সব তাদেরই গবেষণার ফল। আর তার জেঠু হলেন এক নাটক পাগলা মানুষ। বহু বছর নাটকের দল চালাবার পর এবারে দূরদর্শনে সিরিয়াল করার মাধ্যমে অডিও ভিসুয়াল মিডিয়াতে পরিচালক হিসেবে মেডেন ইনিংস ওপেন করেছেন। তাই রূপম একদিকে যেমন পারিবারিক ব্যবসার সেলস টিমের হেড, আরেক দিকে তেমন পারিবারিক প্রোডাকশনে অভিনেতাও। ওর পরিচালক জেঠুর সঙ্গে আমার সম্মুখ সাক্ষাৎ না হলেও, বিজ্ঞানী কাকুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার মোলাকাত হয়েছিল। ছিপছিপে লম্বা অভিজাত চেহারার স্বল্পভাষী মানুষ তিনি। সকালে ক্লাব থেকে এক রাউন্ড গল্ফ খেলে তারপর প্রতিদিন অফিসে আসতেন। আর সেই সময়েই বিজ্ঞাপনের লে-আউট দেখিয়ে তার কাছে অ্যাপ্রুভ করাতে যেতাম আমি। কারণ এরপর সারা দিনের জন্য ফ্যাক্টরি আর ল্যাবের কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

এই বিজ্ঞানী কেমিক্যাল রেপেল্যান্টের প্রাকৃতিক বিকল্প সন্ধানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কচ্ছপ ধূপ ছিল মশা তাড়াবার একমাত্র সমাধান। কিন্তু ইনি, তখন থেকেই জোর দিয়ে বলতেন যে ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী এই সব ধূপ আর বেশিদিন টিকতে পারবে না। বাজারে শীঘ্রই আসতে চলেছে নতুন জেনারেশনের মসকিউটো রেপেল্যান্ট। এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের সঙ্গে লড়াই করে সেই বাজারটা ধরাই তার যাবতীয় গবেষণার উদ্দেশ্য।

তবে মশা বড় কঠিন প্রতিপক্ষ। অভিজ্ঞ ব্যাক্তি মাত্রই মানবেন যে সত্যি রণক্ষেত্রে, এক মশারি ছাড়া অন্য কোনও পন্থাতেই তাদের পুরোপুরি ঘায়েল করা যায় না। আমার জানতে খুব ইচ্ছে হত, এই মশা তাড়ানো তেলের শক্তি পরীক্ষা করতে কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়? সেই ছারপোকা মারা বিষের গল্পের মতো নয় তো? 'প্রতিটি ছারপোকাকে ধরে, মুখে এক ড্রপ করে ওষুধ দিয়ে দিন'...

অতি সিরিয়াস চেহারার সেই বিজ্ঞানীকে ওই প্রশ্ন করার মতো সাহস অবশ্য ছিল না আমার। তবে এটা সত্যি যে সেই নিমের তেলের মসকিউটো স্প্রে বাস্তবে তেমন কার্যকরী বা জনপ্রিয় হতে পারেনি। বরং তাকে ছাপিয়ে বাজার দখল করে নেয় ওই কোম্পানিরই নিম তেলের ফিনাইল, যেটা আসলে ছিল মশা মারা তেলটির একটি বাই প্রোডাক্ট।

এই ভদ্রলোক ছাড়া আরও একজন শখের বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কিছুদিন পরে। তার আসল ব্যবসা ছিল ট্রাভেল এজেন্সির। বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কথা বলতে একদিন তার অপিসে গিয়েছি। এক পেল্লায় দশতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে বিচিত্র অলিগলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে অবশেষে সেই অফিসের পাত্তা মিলল। একটাই ছোট ঘরকে পার্টিশান করে রিসেপশন এবং প্রোপ্রাইটারের চেম্বার তৈরি করা হয়েছে। রিসেপশনে বসে অপেক্ষা করতে করতেই দেখলাম, সে ঘরের দেওয়াল জুড়ে কাচের আলমারি ভর্তি অজস্র রংবেরঙের জার। খানিক বাদে যখন ভেতরে ডাক পড়ল সে ঘুরে ঢুকেও দেখি একই ব্যাপার। যাই হোক, বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা শুরু হল প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে। কিন্তু আমার মাথা থেকে খটকাটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। ট্রাভেল এজেন্সির একটাও পোস্টার দেখছি না, এ কেমন ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস রে বাবা? আর এই লোকটাও কেমন যেন একটু খ্যাপাটে ধরনের!

দশাসই চেহারার টাক মাথা সেই ভদ্রলোক আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড টেবিল। আমাকে কাচের জারগুলো নিরীক্ষণ করতে দেখে তিনি মুচকি হেসে নিচু স্বরে বললেন, অবাক হচ্ছেন নাকি? এগুলো সব আমার গোপন গবেষণার ফসল।

তার আগে মিনিট পাঁচেক খোশগল্প করে আমি বেশ মাই ডিয়ার হয়ে পড়েছিলাম তার সঙ্গে। আর গোপন গবেষণার কথা শুনে হুট করে কেন জানি না, আমার মাথায় চলে এল নারায়ণ দেবনাথের কমিক্স 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'-র কথা। কৌতুহলি হয়ে তাই জানতে চাইলাম, কী রকম গবেষণা? আপনি কি বিজ্ঞানী নাকি?

—তা বলতে পারেন। ওটা আমার বিশেষ শখ। পেটের দায়ে ট্র্যাভেল এজেন্সি চালাচ্ছি বটে। কিন্তু সেটা আর বেশিদিন নয়। সব কিছু ঠিকঠাক চললে কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করে দেব...

এই অবধি বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখ চকচক করে উঠল। গোলগোল সেই দুটো চোখ, ঠিক 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের সিনেমা ভার্সানে বিজ্ঞানীর ভূমিকায় সন্তোষ দত্তকে মনে পড়িয়ে দেয়। আমি দ্বিগুণ কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কী প্রমাণ করবেন?

ভদ্রলোক তীব্র উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, আমি প্রমাণ করে দেব যে টাকে চুল গজানো সম্ভব! এই যে দেখুন দেখুন...

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আমাদের মাঝের বিরাট টেবিলটার ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিজের মুণ্ডুটি নামিয়ে আনলেন একদম আমার নাকের ডগায়। তারপর নিজের চাঁদিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, দেখুন... দেখতে পাচ্ছেন, আমার টাকে নতুন করে চুল গজাচ্ছে? ভাল করে দেখুন...

এত কাছ থেকে এত বড় টাক আমি জীবনে কোনও দিন দেখিনি। তার ওপর আবার এত বড় দশাসই একটি লোক বলিদানের হাঁড়িকাঠে মুণ্ডু ঢোকানোর ভঙ্গীতে আমায় এটি দেখাচ্ছেন। আচম্বিতে এমন একটি ঘটনার ধাক্কায় সেদিন আমি কতদূর ঠিক বা ভুল দেখেছিলাম, হলফ করে বলা খুব কঠিন। তবে মনে হল, এক বেলা না কামানো দাড়ির মতো খোঁচা খোঁচা কিছু চুলের আভাস সেখানে দেখা যাচ্ছে। টোঁক গিলে আমি তাই বলেছিলাম, হুঁ হুঁ... সেরকমটাই মনে হচ্ছে!

—শিগগিরিই আরও ঘন হবে! এখন তো সবে তেইশ নম্বর মডিফিকেশন হয়েছে আমার সলিউশনের... আলমারির জারগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আশা করছি পঞ্চাশে পৌঁছতে পৌঁছতে একদম প্রপার জিনিস পেয়ে যাব...

কপাল মন্দ যে খুব বেশিদিনের জন্য ওই ট্রাভেল এজেন্সির বিজ্ঞাপনের কাজ আমরা করতে পারিনি। ফলে সেই শখের বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে যায়। তবে মনে এখনও কৌতূহল আছে, যে পঞ্চাশে পৌঁছে কি উনি ক্ষান্ত দিয়েছেন? নাকি সলিউশনের সংখ্যা এখন সেঞ্চুরির দিকে এগচ্ছে?

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

"চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আমাদের মাঝের বিরাট টেবিলটার ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিজের মুণ্ডুটি নামিয়ে আনলেন একদম আমার নাকের ডগায়। তারপর নিজের চাঁদিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, দেখুন... দেখতে পাচ্ছেন, আমার টাকে নতুন করে চুল গজাচ্ছে? ভাল করে দেখুন... এত কাছ থেকে এত বড় টাক আমি জীবনে কোনও দিন দেখিনি। তার ওপর আবার এত বড় দশাসই একটি লোক বলিদানের হাঁড়িকাঠে মুণ্ডু ঢোকানোর ভঙ্গীতে আমায় এটি দেখাচ্ছেন।"

জলপাইগুড়ি জেলার লোকনাট্য
দেহাতি ডুয়ার্সের সহজ জীবনদর্শন

আমার এই জলপাইগুড়ি ছেড়ে যেতে বড় ভয় করে। কেমন যেন অসহায় লাগে হারিয়ে যেতে বসা সবুজের সমারোহ থেকে দূরে গিয়ে। মাইম থিয়েটারের কাজে বাইরে যাই যখন মনে হয় কখন ফিরব শুকিয়ে যাওয়া তিস্তার পাশে এই জনপদে। সবটা বদলে যাচ্ছে, তবুও। সোনালি চর্তুভূজের মোহে সোনার ফসল, সোনার সংসার ভেসে যাক, তাতে কী! আমার তো সব ফেলেই এসেছি আমাদের পুরনো ভিটেয়। সেই যে ছিন্নমূল হয়ে এলেন আমার পূর্বপুরুষেরা, আমাদের অতীত হারিয়ে গেল অতল অন্ধকারে। কী আমাদের সংস্কৃতি জানি না, আচার ব্রত পালন কীভাবে করব তাও তো বুঝে উঠতে পারি না। এর তার থেকে ধার করে কিছু একটা করি। তবুও তো করি। তাই পুনারায় শিকড় ছড়ানোর যে চেষ্টা করছি তাও যদি হারিয়ে যায়, ভয় হয়! জলপাইগুড়ির জল হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে বাইরে গিয়ে অনেকেই বলতে পারেন, 'কী আছে বলতো ওখানে, ইতিউতি আড্ডার দল আর চারটি সংস্কৃতি করা লোক। আর একটু মুখ বিকৃতি করে বলবেন ওঃ হো! এখন তো আবার মল হয়েছে তোদের ওখানে!'

আমি না সত্যিই জানতাম না মল মানে অন্য কিছু হয়! তবুও কিন্তু পাশে ফলগুধারার মতো আছে তেভাগা আন্দোলনের জলপাইগুড়ি, সন্ন্যাসী-ফকিরদের জলপাইগুড়ি নকশাল আন্দোলনের জলপাইগুড়ি, চা-শ্রমিক, কবি-লেখক-শিল্পী, আদিবাসী-জনজাতিদের জলপাইগুড়ি। সব ধারাগুড়ি ধীরভাবে বয়ে চলা তিস্তার মতো। আসলে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে বাঁধলে জীবন-সংস্কৃতিতে তার ছোঁয়া তো লাগবেই। সবুজ কমে গিয়েছে অনেক, তবুও কত প্রকারের সবুজ যে এখনও দেখতে পাই আমরা এখানে! আনন্দ হয়।

সমতল-নদী-পাহাড়, তার কোলে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি রসসিক্ত, বৈচিত্রপূর্ণ। জলপাইগুড়ি নামটিও বড় মিঠে। যদিও বাংলা শব্দ নয়। মূকনাট্যের কাজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গেলে খুব মজা হয়। প্রায় সব জায়গায় জিজ্ঞেস করেন, ও তোমরা কলকাতা থেকে এসেছ? আমরা বলি না জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি। কলকাতা থেকে যার দূরত্ব ছ'শো কিলোমিটারেরও বেশি। আর এ ছুতোয় জলপাইগুড়ি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিই। আর তখন তাঁরা বলেন, আমরাও জলপাইগুড়িতে যাব। আসেনও।

Jalpaiguri শব্দটি ইন্দো-ভোট-চীন-এর ছায়ায় বিশ্লেষণ করা যায়। JE-LE বিনিময় কেন্দ্র। PE উল বা কম্বল বা গরম বস্ত্র। GO

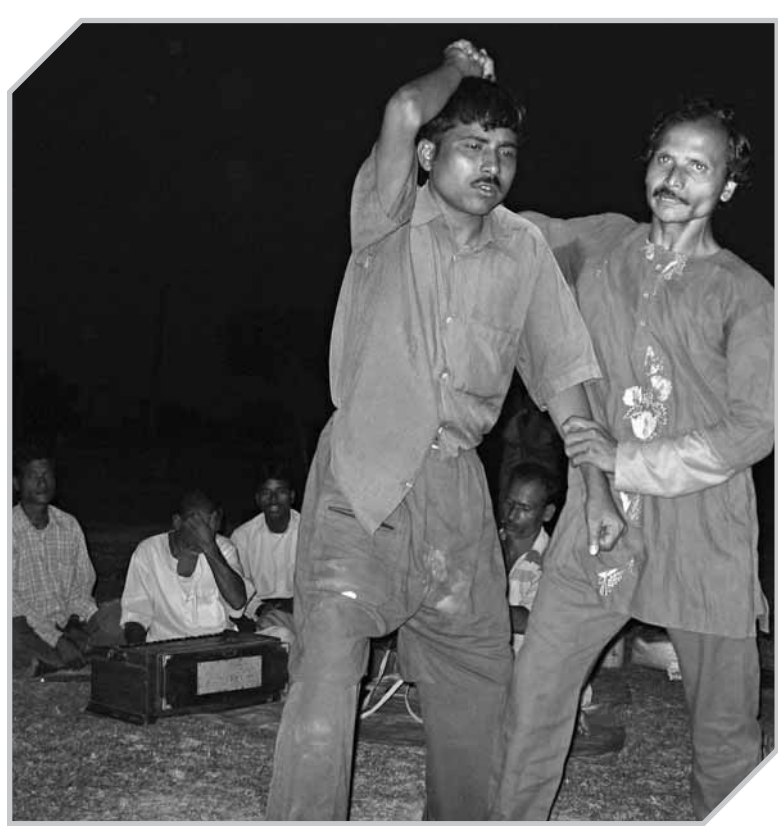

দরজা বা দুয়ার, RI পাহাড়। শীতের সময় বা জল্পেশ মেলায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে নেপাল, ভুটান, তিব্বত থেকে গরম বস্ত্র নিয়ে আসতেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা। তাই জেলেপগোরী এবং ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ি।

কোচবিহার রাজের ছত্রধর রূপে বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিশ্বসিংহের ভাই শিশ্বসিংহ। তাঁরা কোচ। উপাধী রায়কত। পরে বৈকুণ্ঠপুর রংপুরের পরগনায় পরিণত হয়। তারও পরে বৈকুণ্ঠপুর ইংরেজদের অধীনস্ত হয়। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি একটি জেলা হিসেবে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করে।

জলপাইগুড়ির লোকসংস্কৃতি

সংস্কৃতি চর্চায় জলপাইগুড়ি প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক, কল্পনা ও বিশ্বাস থেকে সংস্কৃতিরর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। অরণ্য, নদী, পর্বত প্রশ্রয় দিয়েছে। উত্তরবঙ্গসহ জলপাইগুড়িতে ঋতুগুলির পার্থক্য খুব ভাল বোঝা যেত। যদিও এখন মূলত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকে অনুভব করা যায়। অতীতে তাই ঋতুকে ঘিরে আচার ভিত্তিক লোকনাট্য বা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির প্রাচুর্য, নদীর জল ও পলি এই অঞ্চলকে উর্বর করেছে। তাই অবসর বিনোদনের জন্য গান, নাটক তৈরি করেছেন কৃষিজীবি মানুষেরা। জলপাইগুড়িতে রয়েছেন আদিবাসী মানুষ, রাজবংশী, বাংলাদেশ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষ, পরিবর্তিত মুসলিম সমাজ, তামাং, সবচেয়ে ছোট প্রাচীন জনগোষ্ঠী টোটো ইত্যাদি আরও অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই রয়েছেন নিজ সংস্কৃতি এবং আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র রূপে। নৃত্য-গীত-নাট্য-চিকিৎসা-স্থাপত্য-শিল্প সমস্ত বিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী। আমরা আমাদের এই রচনায় সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব না স্বাভাবিক ভাবেই। আমরা আমাদের এই আলোচনায় জলপাইগুড়ি লোকনাট্য বিষয়ে কিছু কথা বলবার চেষ্টা করব। জলপাইগুড়িতে বসবাসকারী সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী রাজবংশী নামে পরিচিত। তাই তাঁদের নাট্য বিষয়ে আমার উপলব্ধির কিছু কথা বলব। রাতের পর রাত জেগে নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অন্য মাদকতা আছে। তার সেই অদম্য আকর্ষণে বারবার ছুটে যেতে হয়। রাজবংশী জনজাতির আচার অনুষ্ঠানে নাট্য প্রদর্শন হয় অনেক সময়ই। আমাদের জেলার আদিবাসীদের লোকনাট্যের কোনও রূপ আমরা দেখতে পাই না। তাঁদের আছে নৃত্য। তাতে অভিনয় আছে বটে, নাট্য বলা যায় না। তামাংদেরও আছে নৃত্য। বাগপা নৃত্যে কিছুটা নাট্যধর্মী আছে।

> “জলপাইগুড়িতে রয়েছেন আদিবাসী মানুষ, রাজবংশী, বাংলাদেশ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষ, পরিবর্তিত মুসলিম সমাজ, তামাং, সবচেয়ে ছোট প্রাচীন জনগোষ্ঠী টোটো ইত্যাদি আরও অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই রয়েছেন নিজ সংস্কৃতি এবং আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র রূপে। নৃত্য-গীত-নাট্য-চিকিৎসা-স্থাপত্য-শিল্প সমস্ত বিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী।”

লোকনাট্যকে আমরা দু'টি সাধারণ ভাগে ভাগ করতে পারি। আচার কেন্দ্রিক লোকনাট্য ও বিনোদনমূলক লোকনাট্য। আচার অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে বিশ্বাস-ভয়-ভক্তি থেকে। প্রকৃতিকে তুষ্ট করবার জন্য নির্মিত হয়েছে সংগীত-নৃত্য-অভিনয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করে যে জাদুবিশ্বাস, তা মানুষকে লড়াই করবার শক্তি যোগায়। গ্রামীণ লোকসমাজ দেবতাদের ঘরের লোক বানিয়ে ছেড়েছেন। তাই তাদের প্রতি ব্যবহার ও আত্মীয়স্বজনের মতো। নিবেদনের বক্তব্যও একেবারে ঘরোয়া। এমনকি সেই কথায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় যা ভদ্রসমাজে ব্রাত্য।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেই ফসল উৎপাদন করতে হয়। প্রখর রোদ, প্রবল বৃষ্টিতে যে খাটুনি তা থেকে দেহকে বিশ্রাম যেমন দিতে হয় তেমনই প্রয়োজন মনের আরাম। তাই হয় গান,

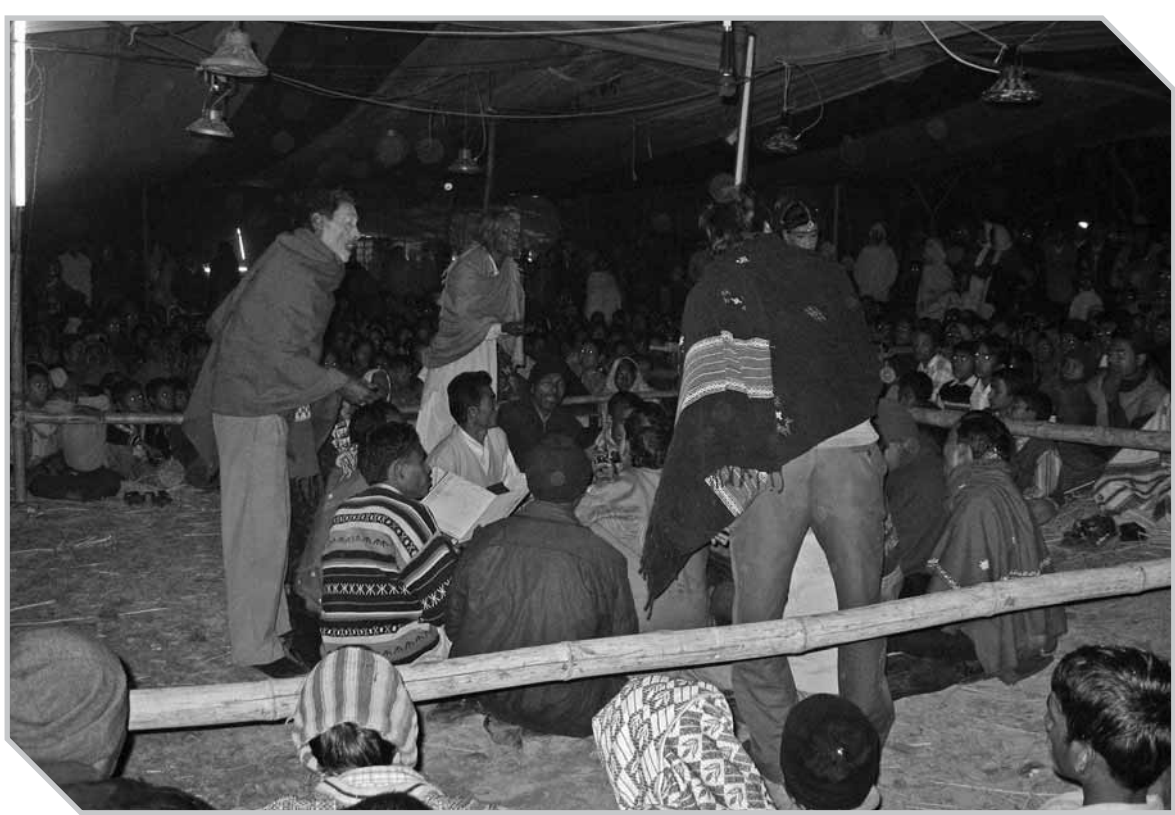

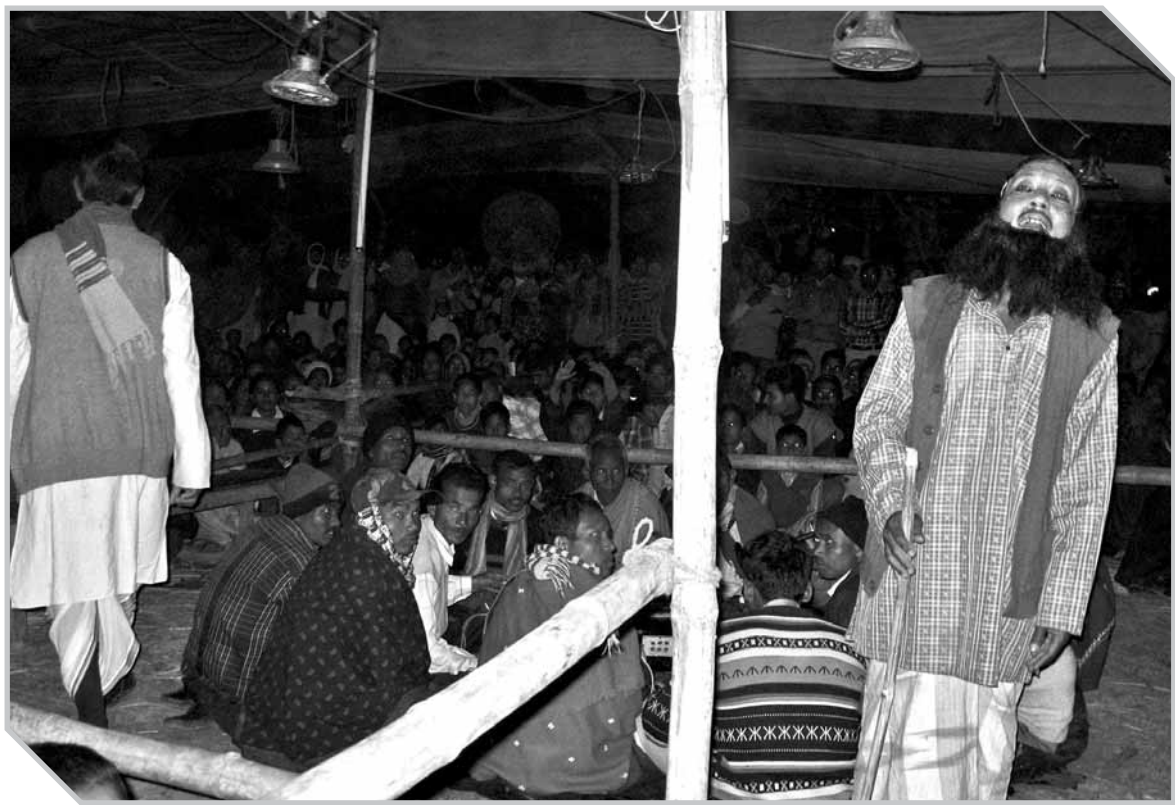

নাট্য। অবসর বিনোদনের জন্য। লোটনাট্য এখনও গ্রামের মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের। টেলিভিশন-সিনেমা বা অন্তর্জালের শাসন থাকা সত্ত্বেও। তাই এক একটি আসরে দু'-আড়াই হাজার দর্শকের উপস্থিতি খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

আনুষ্ঠানিক বা আচারধর্মী লোকনাট্য বিষহরি, চোর-চুন্নী, গমিরা খেল বিনোদনের জন্য আছে পালাটিয়া, ধামগান। এখন লোকনাট্যের ধরনগুলি নিয়ে কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

বিষহরি

বিষহরি পালা মূলত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং জেলার সমতল ভাগে বহুল প্রচলিত। বিষহরি-বিষহরা, কানি বিষহরী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষহরি পদ্মপুরাণ প্রভাবিত মনসার গান। মনসামঙ্গল কাব্য বঙ্গ সমাজে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। বিষহরি পালার যে কাহিনি জলপাইগুড়িসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে অভিনীত হয় তা মালদহের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের রচনা। মনসা লোকদেবী। মনসাদেবীই রাজবংশী-দেশী-পলি সমাজে বিষহরি। দেবী মনসার পরিচয়, মাহাত্ম, মর্তে দেবীর পূজা স্থাপন থেকে ভাসান। সম্পূর্ণ পালাটি এভাবেই বিন্যস্ত।

> "লোকনাট্যগুলি শুরু হয় সংগীত ও ছোকরা নাচের মধ্য দিয়ে। ছোকরা বা ছুকরি, ছেলেরা মেয়ে সেজে এই নৃত্য পরিবেশন করে। এই নাচগুলিতে যৌন আবেদন থাকে। কারণ যৌনতা খুব স্বাভাবিক তাঁদের কাছে। তাকে শালীনতার মোড়কে কুৎসিত করে তোলার কোনও চেষ্টা নেই, তাই সুন্দর। এরপর বন্দনা। বন্দনার দ্বারা সমস্ত দেবদেবী-আল্লা-গড সর্বধর্মের ঈশ্বরের আরাধনা করেন।"

গৃহস্থের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন শিশুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিষহরি পালার আয়োজন করা হয়। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। তা হল বিষহরি সাধারণত গীত রূপেই পরিবেশন করা হয়। গৃহস্থের মানসিক থাকলে তবেই বিষহরি পালার অভিনয় করা হয়। তিনদিন, সাতদিন ধরে চলে এই পালা।

দু'প্রকার বিষহরি রয়েছে। 'কানী বিষহরি' ও 'গীতালী বিষহরি'। বিষহরি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক চারুচন্দ্র স্যান্যাল তাঁর রাজবংশী'স অফ নর্থ বেঙ্গল বইয়ে লিখেছেন In all ceremonies related to Marriage, Sradh, Pregnancy and Child birth, worship is offered to Bisohori Thakurani in t he outer yard of the house with curd, flattened rice and ripe plantain as offering. There are two types of Bisohori. One is Kani-Bisohori which is more commonly worshipped. The other is Gitali Bisohori. She is worshiped during a marriage ceremony. The image consists of Beulani (Behula), Bala (Laccкhindar), Goda, Godani, Washer woman, Siva, Fish, Snake etc. গৃহস্থের মানসিক অনুসারে বছরের যে কোনও সময় পালার আয়োজন করা হয়। তবে শ্রাবণ মাসে মনসাদেবীর পূজা, গান, পালা খুব বেশি হয়। এ উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ সাপের জন্য অত্যন্ত সুখকর বাসভূমি। সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি হয় বলে বিষহরি প্রাচীন কাল থেকে পূজ্য দেবতা।

বিষহরি পালায় মূল গায়ক থাকেন একজন, তাঁকে বলা হয় 'গীদাল' এবং তাঁর সহকারী একজন থাকেন, তিনি 'দোয়ারী'। এই গীদাল

ও দোয়ারীর জন্যই পালার গুণমান নির্ভর করে। মূল গীদালের হাতে থাকে চামর। এই দুজনই পালা এগিয়ে নিয়ে চলেন। প্রয়োজন অনুযায়ী আসেন অন্যান্য চরিত্ররা।

চোর-চুন্নী

চোর-চুন্নী একটি অনবদ্য লোকনাট্যরূপ। সংগীত-নৃত্য-অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই লোকনাট্যকে চোর-চুরনী নামেও ডাকা হয়। দিনাজপুরে পরিচিত চক-চুন্দী নামে। আচার কেন্দ্রীক লোকনাট্য হলেও এই পালায় সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষত দরিদ্র মানুষগুলোর প্রতিদিনকার কষ্টের কথা ও কাহিনি পরিবেশিত হয়। রাধা-কৃষ্ণকে ঘিরে চোর-চুন্নীর যে পালা জলপাইগুড়িতে প্রচলিত ও জনপ্রিয় তার রচয়িতা ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্যাঙকান্দী গ্রামের কামভোলা রায়। এখানে চোর কৃষ্ণ এবং চুন্নী রাধা। কিন্তু তাঁরা গ্রামের অন্যন্ত দরিদ্র স্বামী-স্ত্রী। সংসার প্রতিপালনের জন্য কত কিছুই যে তাঁদের করতে হয়। চোর-চুন্নীর গানগুলিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তেমনই একটি গানের উল্লেখ করব। এই সংগীতটি চারুচন্দ্র স্যান্যালের সংগ্রহ—

বন্দনা

বন্দনা করি আমি চোর চকরপতি
চোর চকরপতি রে তোর পদে ভকতি
কি গুন মন্তরের জোরে চুরি কর দিনদুপুরে
তোক ধরিতে কাঁহো নাহি পারে
নাই কারোর শকতি।
খনেক ছোয়া, খনেক চোরা, খনেক গাবুর
খনেক বুড়া, খনেক তুই নবীন চেঙ্গরা খনেক থুবরী
বন্দনা করি চোর চকরপতি।

চুন্নী—

মুই দ্যাখেছু তোর রে চোরা
গলপ্ কথাই সার
কি কহিম আর, যা ক্যানেতে ওরে
চোরা চুরি করিবার
যে জন চোরা করে চুরি
তার মাইয়া পিনধেছে সাড়ী
পাটই না বোম্বোই দেখো মান্দ্রাজী
ফুল তোল বোট্টি পিনধেছে
হাওয়ার চাদর গায় দিছে
ঘরের ভিতর বস্যা আছে
দেখিতে মজা কি বাহার
যা ক্যানে তুই ওরে চোরা
চুরি করিবার।

চোর—

চুরনী, ক্যানে কর ভাবনা
হপকতে করিনু বিয়ো
নাই দেও গাহেনা, তাতে কিসের ভাবনা
দাঁও পালে মুই করিম চুরি
কতো পিনদাম গাহেনা।
চুরনী; চুরি করিবা যাম সেই দিন
সয়ের জিনিস কতোই আনিম
গাহেনা পাতি কাপোড় চোপড় কতই যে আনিস্
চুরনী, দেখিস্ সে জিনিষ
নিন্ নোতুন তোর বাহার দেখিস
সে কাথা তুই না ভাবিস।

চুন্নী—

চোরা রে, আজি একখান চুরি করিস ধোকরা
মেরে নারীর এ্যাকটা ফোতোই সার
গাও ধোলে নাই পিন্দিবার
মোর বাদে তুই ফোতা আনিস একজোড়া
দিনে দিনে কতো বেড়াম
এক কাপড়া হয়া।
(পুরানো বানানে লেখা)

চোর-চুন্নী পালার অভিনয় হয় কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাতে। এই রাতেই কালীপুজো হয়। কথিত আছে আয়ান ঘোষ স্ত্রী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের অভিসারের কথা জানতে পেরে তার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। অনেক ফন্দি করেন। অবশেষে এই রাতে নিজেই রাধাকে অনুসরণ করেন এবং কৃষ্ণকালীর দর্শন পান। অর্থাৎ রাধা দেখছেন কৃষ্ণকে আর আয়ান ঘোষ দেখছেন শ্রীরাধা কালীর আরাধনা করছেন।

গমিরা

গমিরা। গম্ভীরা নয়। গম্ভীরা মালদহে আর গমিরা জেলা জলপাইগুড়ি জুড়ে। আচার কেন্দ্রিক এই লোকনাট্যের অভিনয় হয় গৃহস্থের উঠোনে। চৈত্র সংক্রান্তি বা তার দু'চার দিন আগে থেকে গাঁ-গঞ্জে এই গমিরা পালার অভিনয় হয়। চলে অম্বুবাচী তিথি পর্যন্ত। শিবের প্রতিষ্ঠার পর শিবের স্তুতি ও শিবের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়। ব্যবহার করা হয় মুখোশ। একজন অধিকারী বা পুরোহিত থাকেন তিনি মন্ত্রের দ্বারা মুখোশগুলিকে জাগ্রত করেন। এই পুরোহিতকে 'দেবাংশী' বলা হয়। তাঁদের অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী মনে করেন সকলে। বিশ্বাস করেন অমিত শক্তির বলে তাঁরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

ধামগান

ধামগান অবসর বিনোদনের জন্য পরিবেশিত লোকনাট্য। এর সঙ্গে আচার বা ব্রত পালনের কোনও সম্পর্ক নেই। ধাম কথাটির অর্থ স্থান। যেমন 'মাইয়ার ধাম'। কোনও দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন যেখানে সে স্থানকে বলা হয় ধাম। প্রাচীনকালে দেবতার নামে যে স্থান বা অঞ্চল সেখানে নাট্য আসরের আয়োজন করা হত। জমির মালিক বা যাঁদের সামর্থ থাকত তাঁরা এই আসরের খরচ বহন করতেন। সাধারণত দোল পূর্ণিমায় এই আসর বসত। পুরাণ কথা, রামায়ন, মহাভারতের কাহিনি এই পালাগুলিতে অভিনীত হত। অনেক সময় দেখা গেছে দোল পূর্ণিমার রাত থেকে পর পর কয়েক রাত্রি ধামগানের অভিনয় করত ভিন্ন ভিন্ন দল। গ্রাম বা গ্রামান্তরের দল অংশ গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও হত। ধামগানের একটি রূপ পালাটিয়া নামে লোকপ্রিয় হয়েছে। ধামগান হারিয়ে গেছে।

পালাটিয়া

পালাটিয়া জলপাইগুড়ি জেলার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাট্য ধারা। বিভিন্ন গ্রামে পালাটিয়ার দল বাণিজ্যিকভাবে অভিনয় করে। মানিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি জেলার এই অঞ্চলটি পালাটিয়ার জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। এখানকার লোকনাট্য দলগুলি দুর্গাপুজোর পর থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত পালাটিয়া অভিনয় করে এবং তাদের রোজগার টাকার অঙ্কে বেশ ভাল।

কাহিনির ধরন অনুযায়ী পালাটিয়া তিন প্রকারের হয়। মানপাঁচাল, খাসপাঁচাল এবং রংপাঁচাল। পুরান কথা, কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, রামায়ন-মহাভারতের কাহিনি নিয়ে যে পালাগুলি অভিনয় করা হয় সেগুলি মানপাঁচাল। সমাজে আলোড়ন তোলা প্রেমকাহিনি, কেচ্ছা বা পুরুষ-মহিলার অবৈধ সম্পর্ককে ঘিরে যে কাহিনি সত্য, বাস্তব তাই নিয়ে পালা বাঁধা হলে তাকে খাসপাঁচাল বলা হয়। রংপাঁচাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কাল্পনিক কাহিনি তৎসহ সামাজিক ঘটনা মিশিয়ে এই পালার অভিনয় হয়। এখন পালাটিয়ার এই রূপটিই সর্বাধিক প্রচলিত।

লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি লোকনাট্যগুলি সমাজের দর্পন। সমাজের তথাকথিত দেহাতি নিরক্ষর সাধারণ মানুষগুলি অত্যন্ত সহজকথায় জীবনদর্শন, আদর্শ আধ্যাত্মবাদের ধারণা সকলের কাছে পৌঁছে দেন। তাঁরা সবসময় বলেন সম্প্রীতির কথা। সহিষ্ণুতার কথা। অপরের মতকে, চিন্তাকে সম্মানের কথা বলেন। সেই অতীত কাল থেকেই। যে বিষয়টা আমরা শহুরে শিক্ষিতরা আজও বুঝতে পারলাম না। রাজনীতির লোকেরা তো নয়ই। তাই তো তাঁরা পালা বানান ব্যঙ্গ করে। নাম দেন 'উপরচোখা প্রধান, বাঙ্গিফাটা পঞ্চায়েত'।

লোকনাট্যগুলি শুরু হয় সংগীত ও ছোকরা নাচের মধ্য দিয়ে। ছোকরা বা ছুকরি, ছেলেরা মেয়ে সেজে এই নৃত্য পরিবেশন করে। এই নাচগুলিতে যৌন আবেদন থাকে। কারণ যৌনতা খুব স্বাভাবিক তাঁদের কাছে। তাকে শালীনতার মোড়কে কুৎসিত করে তোলার কোনও চেষ্টা নেই, তাই সুন্দর। এরপর বন্দনা। বন্দনার দ্বারা সমস্ত দেবদেবী-আল্লা-গড সর্বধর্মের ঈশ্বরের আরাধনা করেন। প্রার্থনা করেন আসর যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। অনেক আগে পুরুষরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। বেশ কিছুকাল হল মহিলারা নাট্য অভিনয়ে যোগ দিচ্ছেন। বন্দনার পর কাহিনি বিস্তার ও সমাপন।

খুব সাধারণ পোশাক ও রূপসজ্জা চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। আসর বসে কারুর বাড়ির বড় উঠোনে বা খোলা মাঠে। পরিষ্কার করে গোবর জলে নিকোন হয়। কখনও বা অভিনয় স্থল মাটি দিয়ে কিছুটা উঁচু করা হয়। ওপরে টাঙিয়ে দেওয়া হয় চাঁদোয়া। দর্শক বসেন আসরের চারপাশে মাটিতে খড় বিছিয়ে তার ওপর ত্রিপল দিয়ে, মহিলা ও পুরুষদের বসবার স্থান আলাদা। অভিনয় অংশের ঠিক মাঝখানে বসেন বাদ্যযন্ত্রীরা ও দোহার। এই অংশে অভিনেতৃরা বসেন এবং সেখান থেকে উঠে অভিনয় করেন আবার বসে পড়েন। দর্শকদের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ অভিনয় অঞ্চল থেকে অস্থায়ী বা স্থায়ী কোনও সাজঘরে শেষ হয়। সেখান থেকেও তাঁরা যাতায়াত করেন। কেন্দ্র ও দর্শকাসনের মাঝের অংশটি অভিনয় ক্ষেত্র। অভিনয়ের এমন মঞ্চব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের বিশেষত্ব।

আচার, বিনোদনের সঙ্গে লোকনাট্য লোকশিক্ষার কাজও করে থাকে। তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-বিশ্বাস অমলিন। যাঁরা এই পালাগুলিতে অভিনয় করেন তাদেরও খুব কাছের মনে করেন। আচারকেন্দ্রিক লোকনাট্যগুলির খরচ বহন করেন গৃহস্থ। বিনোদনমূলক লোকনাট্যের খরচ সংগ্রহ করা হয় অন্যভাবে। এখন একদিনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে খরচ পড়ে কমবেশি তিরিশ হাজার টাকা। দলগুলি পঁচিশ হাজার টাকা নিজেদের প্রযোজনা ও যাতায়াত খরচ বাবদ নেয়। বাকিটা খাওয়া ও আয়োজনের জন্য। আয়োজকরা এই অর্থ সংগ্রহ করেন জুয়ার আসর থেকে। যেখানে এই আসর বসে তার

"অভিনয় অংশের ঠিক মাঝখানে বসেন বাদ্যযন্ত্রীরা ও দোহার। এই অংশে অভিনেতৃরা বসেন এবং সেখান থেকে উঠে অভিনয় করেন আবার বসে পড়েন। দর্শকদের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ অভিনয় অঞ্চল থেকে অস্থায়ী বা স্থায়ী কোনও সাজঘরে শেষ হয়। সেখান থেকেও তাঁরা যাতায়াত করেন। কেন্দ্র ও দর্শকাসনের মাঝের অংশটি অভিনয় ক্ষেত্র। অভিনয়ের এমন মঞ্চব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের বিশেষত্ব।"

থেকে কিছুটা দূরে নিরিবিলি ঝোপের আড়ালে জুয়ার আসর বসায় কোনও দালাল। সেই দালাল আয়োজক গোষ্ঠীকে বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার দিয়ে থাকে। বাকি অর্থ সংগ্রহ করা হয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। লোকনাট্যকে ঘিরে মেলা বসে। সেখান থেকেও কিছু টাকা পাওয়া যায়। জুয়ার টাকায় গ্রামবাসীরা অন্যায় কিছু দেখেন না। আসলে জীবনযাত্রাসহ লোকনাট্য এত সহজ সরলভাবে চলে জটিলতার কোনও অবকাশ নেই। খোলা অঞ্চলে এই আসর বসে। কিন্তু কোনও রূপ অশান্তির খবর বা আইনি সমস্যা হয় না। হলে পরেও খুব সহজে মিটে যায়। এটা প্রশাসনের কোনও কৃতিত্ব নয়, মানুষগুলোই যে বড় ভাল। এখনও।

সব্যসাচী দত্ত

কলকাতায় গ্রাহক নেওয়া হবে।

কলকাতায় 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার ২০১৮ সালের গ্রাহক নেওয়া হবে। এবার ঘরে বসেই নিয়মিত পেতে পারেন আপনার কাঙ্খিত পত্রিকাটি।

চাইলেই কলকাতার বাড়ি বা অফিস/দোকানের পুরো ঠিকানাসহ মেল করুন। কমপক্ষে ১০০ জন না হলে এই পরিষেবা চালু করা যাবে না। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যে মেল আসবে তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

editor.ekhonduars@yahoo.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় লেখা পাঠান

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

সবুজের মধ্যে বসে রক্তের স্বাদ পাচ্ছি। কানুকে খুন করে ফেলা হয়েছিল। 'মাল' বলতে কী বোঝাচ্ছিল? হীরে, জহরত? ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে শ্যামলের ঘরে খুলে সোনা পেলাম না, কিছুই পেলাম না সে অর্থে। গাড়ি চালিয়ে শালবনের মধ্যে দেখলাম সদ্য খুন হয়ে যাওয়া মানুষ। মাথাটা আলাদা। রাত হলে বোঝা যাবে কতটা খেলবে রুক্মিণী। তারপর আসবে এক বরযাত্রীর দল। আমি তৈরি হচ্ছি। মাড়োয়ারি ধর্মশালায় সব উঠবে। তারপর? **সাগরিকা রায়ের** থ্রিলার।

(২০)

নদীর বুকে ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধের গন্ধমাখা নদীতে শুয়ে থাকা... আহা! কী চমৎকার। ঠান্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুম আসছে। হালকা ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে নদী জুড়ে। কেউ হাওয়ায় ভেসে যেতে যেতে বলে গেল —ও দয়াল, হাউস করি তুই দুনিয়া বানালু... এই বাতাস দয়ালের...! পাপ করি নাই। আমি ঘুরে বেড়াব ডুয়ার্সের হাওয়ায়। এইখানেই থাকব। তন্দ্রা ছুটে গেল। আমি উঠে বসলাম। কে এসেছিল এখন? নিখিল?

ওহো, নিখিলের বাড়িতে খোঁজ নিতে হবে। নিখিল একটা কাজে কলকাতায় গেছে। তো ওর দিদি কি ক'টাদিন কাজ চালিয়ে দিতে পারবে? এর জন্য মাইনে ভালই পাবে। একটু আধটু রাঁধতে জানে? ডাল, ভাত, সবজি? ব্যাস! তাহলেই হবে। এসব প্রশ্ন করতে হবে। হোম টাস্ক করেই যাই সব রকম কাজে। এতে খুব সুবিধে হয়।

ঘড়িতে সময় দেখে নিলাম। এখন নিখিলের বাড়িতে বেশ ঘুরে আসা যায়। সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতে উঠে ঠিকানাটা মনে করতে চেষ্টা করছি। মাইল দুয়েক দূরে ওদের বাড়ি। খোঁজখবর করে ঠিক পৌঁছে যাব। এবং গেলামও। গাছে পাতায় মাটিতে জলে ভরা ভর্তি নিখিল-এর বাড়ি। জলে ডোবা কচুগাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে আঁশটে গন্ধ। বৃষ্টির জলে ডুবুডুবু বাড়ি। গাড়ি দেখে উৎসাহে বেরিয়ে এল অনেকে। নিখিলের বাবা, মা ছাড়াও দিদিটা ছিল। বর্ষার জল পেয়ে লাউডগার মতো তরতর করে বেড়ে উঠেছে। চ্যাপ্টা নাকে লাল পাথরের ফুল। কানে ইমিটেশন ঝুমকোর রং চটে গেছে! একখানা বিবর্ণ শাড়িতে শরীর ঢেকে রাখতে প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই শরীর যদি একটা কাঁচুলি ব্লাউজ পায় আর লেসের শাড়ি? গা গরম হয়ে উঠছে আমার। মোটা চালের ভাত আর শাক কত কিছু করতে পারে! এই জল জঙ্গলের মধ্যে এমন চিজ!

নিখিলের বাবা আমার আসার উদ্দেশ্য জানতে পেরে খুশি হল। চিন্তা কিসের? মুখ দেখে এ কথাই মনে হল যে নিখিলের বাবাটা এই কথাই ভাবল মনে মনে। নিখিল তো আছেই। আর নিখিল নিশ্চয় আমার ভূয়সী প্রশংসাই করেছে বাড়িতে। আপত্তি ছিল না। কথা হল, কাল মেয়েকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে নিখিলের বাবা। নিখিল ফিরে এলে দিদি ফের বাড়িতে ফিরে আসবে! টাকা পয়সার দরকার আছে কি না জানতে চাইলাম গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে। ওরা তো তো করছিল। ওয়ালেট খুলে দুটো পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে এলাম। কৃতার্থের হাসি হাসছিল নিখিলের বাবা! গলে, ভেসে... একেবারেই যাচ্ছেতাই দশা!

বিদায় নিয়ে গাড়ি ঘোরালাম। একহাঁড়ি রসগোল্লা দিয়ে এসেছি। আমার গাড়ি বাঁক পেরনোর আগেই মেয়েটি গপাগপ মিষ্টি মুখে দেবে। সিওর। দেখেছি খেয়াল করে মেয়ে বারবার হাঁড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। বেশ বড় সাইজের মিষ্টি। গাঁয়ের আটার দলা নয়! মেয়েটার লোভ আছে! এটা জানাটাই আমার দরকার ছিল। লোভীকে নিয় সমস্যা হয় না। কিন্তু নিখিলের মতো মানুষ ঝামেলা করে। তখন আর কী বা করার থাকে! আমি কি নিখিলের এই ভয়াবহ পরিণতি চেয়েছিলাম? না, চাইনি। বোঝাতে চেয়েছি। লোভের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছি। কিন্তু ওই! ভালমানুষি শেষ করে দিল ছেলেটাকে! আজ ফিরে গাড়ির চাকা ধুতে হবে।

ফিরে আসতে আসতে হালকা মিউজিক শুনছি। গাঁ-গ্রামের লোকেরা এত বোকা কী করে হয়? নিজেরাই তো কাঠ পাচার করতে সাহায্য করতে পারে! তাহলে আর যুবতী মেয়ে পরপুরুষের নজরে পড়ে না! নিজের বাপ কি বরের পয়সায় রসগোল্লা খেতে পারে!

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজিরা দিয়ে চলে আসব। বরকর্তা আসবে আমার বাড়িতে। কনের বাড়ি ধর্মশালার কাছাকাছি। একবার দেখাশোনা করে আসি। বরকর্তা আমার সঙ্গে এল আমার বাড়িতে। কথাবার্তা হল। এই সময়ে সত্যমের ফোন! লেটেস্ট নিউজ জানতে চায়। লেটেস্ট নিউজ আবার কী সত্যম? তোমার ওয়েপনের কাস্টমার এসে গেছে। কনে এবারে বরের বাড়ি চলে যাবে রাতারাতি। আর কিছু ক্যাশ আসবে আমার বাড়ি। হা হা হা!

শ্যামল এখানে নেই। এটা এই মুহূর্তে খুব ভাল খবর। নাহলে সত্যমের চর হিসাবে যা যা দেখত, সব চলে যেত সত্যমের কানে। সত্যমের মতো ভয়াবহ লোক আমি কমই দেখেছি। মনে আছে সুবোধবাবুর ঘটনাটা। সত্যমের নব কীর্তি। ওর দরকার ছিল একটি রেস্তোরাঁর জন্য সুবোধবাবুর বাড়িটা। ও কথা বলেছিল সুবোধবাবুর সঙ্গে। সুবোধবাবুর সঙ্গে গত সোমবার দেখা হয়েছিল। উনি কেমন নড়বড়ে ছিলেন। ভাসা ভাসা চোখে আমার দিকে তাকালেন, যেন প্রথম দেখছেন আমাকে! আমি জানতে চেয়েছিলাম উনি কেমন আছেন। সুবোধবাবু এলোমেলো কথা বলছিলেন। অনেক কথার মধ্য দিয়ে সত্যম নামটা কানে এসে ঠেকেছিল। কী বলতে চেয়েছিলেন সুবোধবাবু, সেদিন বুঝিনি। গ্রাহ্য করিনি বলাই ভাল। ক'দিন পরেই সত্যম ওয়াইন খেতে খেতে বিরক্তিসূচক শব্দ করেছিল— শালার বুড়ো কথা মানছেই না। এবারে খিস্তিতে কাজ হল না। শেষ হয়ে যাবে ওটা। টাইম আপ।

ক'দিন পরেই সুবোধবাবুর বডি পাওয়া গেল রেললাইনে। টুকরো টুকরো হয়ে আছে লোকটা। পাঞ্জাবি, চশমা, বাজারের ব্যাগ লাইনের পাশে রেখে নেমে গিয়েছেন লাইনের ওপর শুয়ে পড়তে। একটা সুইসাইড নোট পাওয়া গেল জামার পকেটে। বাঁধা গত। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়! সেদিন সত্যম এসেছিল আমার ঘরে। হাতে খাবারের প্যাকেট। সঙ্গে সুরা ও সাকী। কেন এই সেলিব্রেশন আমার জানতে বাকি ছিল না। সত্যম নিজেই জানিয়েছিল। ওয়াইন গিলতে গিলতে লোকটা বলেছিল আজ রেস্তোরাঁর জন্য জমি পেলাম। সেলিব্রেশননন! আমি সত্যমের বুদ্ধির প্রশংসা করি। কত অনায়াসে কত বড় বড় কাজ করে ফেলে ও। এক্ষেত্রে বুদ্ধি না থাকলে হয়? বুদ্ধি আর সাহাস চাই। আমার কি বুদ্ধি কম? সত্যমের এক একটা কাজের পরে নিজের সঙ্গে তুলনা করি। চুলচেরা হিসেব করি। বুঝিনা কিচ্ছু!

যাক, বিয়ে শেষ। কনেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে বর। মহিলারা কাচ্চা বাচ্চাদের সামলাচ্ছে। মাল ঢুকে গেল মহিলাদের গাড়িতে। কিছু গেল বরের সঙ্গে। সুন্দর করে প্যাক করা হয়েছে কনের উপহার সামগ্রী। টিভি, ফ্রিজ এসবের মাঝে কী কী গেল, কে তার হিসেব রাখবে?

কাল আমার গয়েরকাটার বাড়িতে যাব ভাবছি। অনেকদিন এখানে আছি। দেখি ক'টাদিন চেঞ্জ করে। ওহ, কাল হবে না। কাল হবে না। কাল নিখিলের দিদি আসবে। কাল কেন, দিন সাতেকের মধ্যে যাচ্ছি না কোথাও। রুক্মিণী ফিরে আসবে। এসেই সত্যম আর রুক্মিণী চলে যাবে দিল্লিতে। নিজেদের আড়াল চাই ওদের। পুলিশ চক্ষুর আড়ালে থাকুক এখন। ওরাও সেটাই চাইছিল। খুব পরিশ্রম গেল। এখন রুক্মিণীর রেস্ট চাই। কিন্তু ওপরওলা ওকে নিয়ে

"ক'দিন পরেই সুবোধবাবুর বডি পাওয়া গেল রেললাইনে। টুকরো টুকরো হয়ে আছে লোকটা। পাঞ্জাবি, চশমা, বাজারের ব্যাগ লাইনের পাশে রেখে নেমে গিয়েছেন লাইনের ওপর শুয়ে পড়তে। একটা সুইসাইড নোট পাওয়া গেল জামার পকেটে। বাঁধা গত। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়!"

দিল্লিতে যাচ্ছে। লোকটা ছাড়তে চায় না ওকে। এসব জায়গায় অমন জিনিস রোজ কি মেলে? আমার জিনিসগুলো বরের সঙ্গে বিহারে চলে গেল। অস্ত্র পাচার। হাঃ! কত কিছু হয়ে যাচ্ছে, কেই বা তার হিসেব রাখে সত্যম। মাঝে থেকে সুবোধবাবু, নিখিলরা চলে যেতে বাধ্য হয়! চলেই যায়।

কাল আসবে রানি। আমি ওর নাম দিয়েছি রানি। ওর নাম কী? ঘুম আসছে। এস, রানিও এস।

যদি রুক্মিণী এ বাড়িতে আসে, তাহলে রানিকে সামনে আনা যাবে না। সত্যম একবার রানির খোঁজ পেলে রক্ষে নেই আর। পাচার হয়ে যাবে কোথায়! কাল কখন আসবে রানি? আজ সকালে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম। শপিং করলাম। শাড়ি, ব্লাউজ, ইনার কিনে ফিরেছি। সাবান শ্যাম্পুও। মেয়েটা এতসব দেখেনি আগে। খুব খুশি হবে।

সকাল হয়ে গেছে কখন। আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। জেগে উঠে প্রথমেই মনে পড়ল নিখিলের দিদির নাকের লাল পাথরটা। একফোঁটা রক্ত জমে আছে যেন। তাড়াতাড়ি করে উঠে বসলাম। সে আসছে। উপোসি বাঘের গুহায় নধর হরিণ। তেমন হলে ওকে নিয়েই চলে যাব গয়েরকাটায়। অভ্যস্ত হয়ে যাবে মেয়েটা। হুইস্কি খেতে শিখে যাবে দু'দিনেই। স্নান সেরে নিয়ে চা বানিয়ে বসতেই সত্যম চলে এল। দূর থেকে দেখেই চিনেছি! গেট দিয়ে লন পেরিয়ে আসছে এদিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

(২১)

এখন জঙ্গলে খুব কড়াকড়ি চলছে। সত্যম বেশ কিছুদিন দিল্লিতে থাকবে। যাওয়ার আগে বলে গেল যে ভাবেই হোক, বাঘ চাই। সেদিন ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ায় একটা ছোট পার্টি হচ্ছে আমার বাড়িতেই। কথায় কথায় জানালাম নিখিল ছুটি নিয়েছে। কাজেই অন্য কাউকে নিচ্ছি না এখন। সার্ভ যা করার আমাকেই করতে হবে।

রুক্মিণীকে ওপরওলা সঙ্গে রেখেছেন। মজে গেছেন তিনি রুক্মিণীতে। নাকি কলকাতায় পশ এলাকায় রুক্মিণীর পছন্দের ফ্ল্যাট বুক করার বন্দোবস্ত করছেন।

—কী করবে বাঘ দিয়ে? পুষবে?

—জানো না কী করব? সত্যম মদ ঢালছে গেলাসে।

—তাহলে যাওনা ভিয়েতনামে। সাড়ে চারশো গ্রাম বাঘের হাড় পাঁচশো ডলারে পাবে। গেলাসে চুমুক দিলাম। খুব কড়া মদ। একটা গন্ধ আছে। অন্যরকম স্বাদ। চেনা নয়।

—আরও চাও? ব্যাঘ্র লিঙ্গের সুপ, বাঘের হাড়-মাংস দিয়ে তৈরি মদের খুব চাহিদা! তাইওয়ানের তেইপি রেস্তোরাঁয় তিনশো কুড়ি ডলারে পাওয়া যায়। সুপ পাওয়া যায়। এক বাটির দাম বলছি। সত্যম চোখ টিপল। জানে যে সেটা বোঝাল সুপ খেতে চাও তো বল।

—তাহলে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের দাম কত হবে? আমি ওর পরের প্রশ্নের জবাব দিলাম না। গেলাসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছি। শরীর আড় ভাঙছে।

—আট সাড়ে আট লাখ। চাহিদা বুঝে আরও বেশি দাম। বাঘের, প্রস্রাব কৌটো বা শিশিতে ভরে বিক্রি হয়। আরে, জানো না, বাঘের গোঁফ মাদুলিতে ভরে বিক্রি হচ্ছে! সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে চিন— দারুণ চাহিদা!

—কিন্তু, মনে রেখ, বাঘ বাঁচাও প্রকল্প হচ্ছে!

— তা হচ্ছে। কেবল কি বাঘ বাঁচাও? মানুষকে বাঁচাও, গাছ বাঁচাও...! হচ্ছে তো। লম্বা চুমুক দিল সত্যম।

আমি ওকে লক্ষ্য করছি। মদ মুখে দিয়ে চোখ কুঁচকে উঠল —আঃ! কেমন মদটা?

—ফাইন।

—আরেকটা নেবে? বলে ঢেলে দিলাম গেলাসে। অনুমতির অপেক্ষা না করেই।

—কী মদ এটা?

—যা নিয়ে আলোচনা হল। বাঘের হাড় দিয়ে

বানানো মদ। ভাল লাগল?

অদ্ভুত অনুভূতি হল। বাঘ খাচ্ছি? হা হা হা!

সত্যম হাসিতে যোগ দিল না —ব্যবসা মার খেয়ে গেল। ইনফর্মার কে জানতে পারলে ওর হাড় দিয়ে মদ বানাতাম। এতগুলো সোনা! —হিসেবের খাতায় কম দেখাতে পারোনি?

কত কম? সাড়ে তিন কোটির সোনাকে এককোটি দেখাতে পেরেছি। লাভের গুড় খেয়ে গেল পুলিশ পিঁপড়ে।

—পিঁপড়ে আর কতটাই বা খেয়েছে! যাক, বড় ঝামেলা গেল। তোমরা যাচ্ছ কবে?

—কবে? আজই। যত তাড়াতাড়ি পারি। শোন, তোমার কি কোথাও যাওয়ার কথা আছে?

—হ্যাঁ। ছুটি আছে। ভাবছি ক'টা দিন কলকাতায় ঘুরে আসি। ফিরে এসে কলেজে ক্লাস নিতে হবে দু' সপ্তাহ।

—মানে, কতদিন থাকবে না?

—সাতদিন!

—শ্যামল থাকছে? বাঘের ব্যাপারটা মনে রেখ।

—সিওর।

টুকটাক কথাবার্তার পর বিদায় নিল সত্যম। এখন ফ্লাইট ধরতে যাবে।

আঃ আরাম ছিন ছিন করছে শরীরে। কটা বাজে? সাড়ে আট। ওরা কখন আসবে! রোদ ঝা ঝা করছে। গ্রাম থেকে হেঁটেই আসবে। সকালের দিকে এলে এগারোটা, বিকেলে হলে তিনটে হবে। এদের নিয়মকানুন আমার চেনা হয়ে গেছে। কয়েকটা ফোন করার ছিল। মাধব মোড়ে তরুণের সঙ্গে দেখা করলাম। ও হল ইনফর্মার। গতকাল নাকি গদাধর বস্তিতে হরিণ মেরে ভোজ হয়েছে। নাগরু রাভা হল এই কর্মকাণ্ডের হোতা। নাগরুর কি ফোন আছে? আছে। তাহলে নম্বরটা...! তরুণ হতাশ গলায় কথা বলে —এসব আর ভাল্লাগছে না। কিছু টাকা জমলে একটা ম্যাজিক টোটো কিনে নেব। শাল তো শেষ প্রায়! আর কী বা আছে এখানে!

খবর নিয়ে হেঁটে আসছি। নাগরুকে ফোন করব আজ। একটা অর্ডার আছে। ভাল পয়সা পাবে নাগরু। ...মাইক বাজছে। কোনও পার্টির মিটিং আছে হয়ত। বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বানিয়ে 'বন্ধুগণ...' বলছে কেউ। এখন এদিকে অনেক রকম পার্টি, অনেক রকম লোক। প্রায় প্রত্যেক মানুষের হাতে প্যান কার্ড, এটিম কার্ড, আধার কার্ড, বিপিএল কার্ড। ফোন হাতে হাতে। বাজার এলাকার জেরক্স, এক মিনিটে ডিজিটাল ফটো... পাশেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এটিএম... একটা ব্যাঙ্ক...!

পাশ দিয়ে ইনোভা চলে গেল। কে গেল? গাঙ্গুলিদের গাড়ি নাকি? নাঃ, অন্য রাস্তায় বাঁক নিল গাড়ি। ভেতরে কারা? ড্রাইভার ছাড়া পেছনে দু'জন। একজন মহিলা। কে এই মহিলা? গাড়ি ঘুরে যেতেই ডানদিক আমার দিকে পড়তে সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠল। সেই... সেই মেয়েটি! আমার জীবনের অদ্ভুত কাণ্ড এক রাতে শুরু হয়েছিল এই রূপসীর হাত দিয়ে। যে হাত ফিনাইল বেচতে এসেছিল! আরে! গাড়িটা কোথায় গেল? আমি ছুটতে ছুটতে যেখানে গাড়িটা ছিল, সেখানে পৌঁছাতে কিছু দেখতে পেলাম না। চলে গেছে। কিন্তু দাগ রেখে গেল। তার মানে, মেয়েটা আশপাশে কোথাও থাকে! ইনোভার নম্বরটা দেখে রাখলাম না! ওদিকে কোথায় গেল! রিসর্ট আছে কয়েকটা। নতুন হয়েছে কিছু রিসর্ট। সেখানে? ওখানে চাকরি করে কি? নাকি রিসর্টে মক্ষী হয়ে আসে? খোঁজ নিতে হবে। ওই মেয়েটি আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিল মাঝরাতে? কেউ ওকে তাড়া করেছিল একথা কি সত্যি? আবার অনির্বাণ বসুর আগমন। মেয়েটির গুপ্ত চেম্বার থেকে উধাও হয়ে যাওয়া... সব কেমন যেন ঘেঁটে যাচ্ছে! আজ মেয়েটা এদিকে কোথায় গেল? কে ছিল ওর সঙ্গে? একা একা কাজ করছে না। পেছনে মাথা আছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। এক অদ্ভুত রহস্য ঘিরে রেখেছে আমাকে! যার তল খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আজ সকালে সত্যম বেরিয়ে গেল। রুক্মিণীও যাচ্ছে। শ্যামলের কী হবে জানি না। ও যদি আমার কাছে ফিরে আসে, আমি ওকে গ্রহণ করব অবশ্যই। কারণ আমাকে জানতে হবে শ্যামল সত্যমের কতটা জানে! কী কী জানে! সত্যমের কেসটা নিয়ে থানা আমাকে সতর্ক করেছে। আমি জানিয়ে দিয়েছি সত্যম আমার ফ্রেন্ড নয়। জাস্ট পরিচিত মাত্র। ও নারী, পশু, কাঠ... সব পাচার করে চলেছে। আমি সর্বান্তকরণে এর প্রতিবাদ করি। কিন্তু সোনা পাচারের সময় ধরা পড়ে ঝামেলায় জড়িয়ে আমার হেল্প চায় বলে আমি হেল্প করেছি মাত্র। তবে আর দ্বিতীয়বার এর মধ্যে নেই আমি।

আমার ইমেজটা ঝকঝকে। এর মধ্যে কালি ছিটোতে দেব না। সে রুকু ম্যাডাম হোক, কি অন্য কেউ!

বাড়িতে পৌঁছে নাগরু রাভার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। একটা বায়না আছে। অর্ডার বলা চলে। অর্ডারি মাল চাই। দামে আটকাবে না।

—মালটা কী? হাতির দাঁত? নাকি গন্ডারের শিং? নাগরু বিচ্ছিরি হাসছে।

—পরে জানাচ্ছি। বলে ফোন অফ করে দিলাম। নাগরু সম্পর্কে খোঁজ নেব। গদাধর বস্তির নাগরু রাভা...! লোকটাকে এতদিন চিনিনি কেন? আমার সঙ্গে অনেক রকম নাগরু রাভার পরিচয় আছে। সবাই যে আমাকে সরাসরি দেখে, তেমনটা নয়। বেশিরভাগ অন্যের মারফত কথাবার্তা চলে। এই 'অন্য' ব্যাপারটা খুবই সীমিত। শ্যামল আছে। যদিও শ্যামল যথেষ্ট বিশ্বস্ত নয়।

—বাবু, আমরা আসা পড়ছি। কে কথা বলে উঠল আমার সামনে থেকে।

চমকে গিয়েছি। তাকিয়ে দেখি ধুতি, ফতুয়া পরা নিখিলের বাবা দাঁত বের করে হাসছে। সঙ্গে করে মেয়েকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটা লজ্জা মাখা মুখে আমাকে দেখছিল। লাল ছাপা সিন্থেটিক শাড়ি, লাল ব্লাউজ। কপালে লাল টিপ, সরু চোখে ধেবড়ে যাওয়া কাজল, টেপা ঠোঁট ভরন্ত। চুল টেনে বাঁধা। তেল মেখেছে চুলে। একটা সবুজ গাছের মতো মেয়ে আমার সামনে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। আহহ!!!

২২

মেয়েটা হেসে বলল —আমার নাম মায়া।

আমি হাসলাম —না, তোমার নাম মায়াবী। আমি মায়াবী বলে ডাকলে রাগ করবে?

মায়া ফের হাসল —ডাকবেন।

চা বানিয়েছে মায়া। চিনি ঢেলেছে প্রচুর। শিখিয়ে দিতে হবে। আজ নতুন শাড়ি, ব্লাউজ পরে খুব খুশি মায়া। ওর ঘরের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। আশ্চর্য হলাম মায়া নিখিলের কথা কিছু জানতে চাইল না! অনেকক্ষণ ওকে পাশে বসিয়ে গল্প করলাম। কলকাতায় নিয়ে যাব বলায় অবাক হয়ে গেল। যেন সে এক রূপকথারই দেশ! নিয়ে তো যাব। টাটকা মেয়ে। দাম ভাল পাব। তবে সে অন্য সময় এখন নয়।

রাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আমি মায়ার ঘরে গেলাম।

কলকাতায় যাব কিনা এখন ঠিক নেই। আমার কটা ক্লাস নিতে হবে। কলেজ কামাই করা ধাতে নেই। সেই কলেজ লাইফেও যখন সব বন্ধুরা ক্লাস কেটে সিনেমা দেখেছে, বান্ধবীকে নিয়ে স্ফূর্তি করছে, আমি লাইব্রেরিতে সময় কাটিয়েছি। আমার কোনও বান্ধবী ছিল না। ছিল না বলা বোধহয় ভুল হচ্ছে। কামালগাজিতে আমার মাসি ছিল। মায়ের কাজিন। সেখানে যেতাম। মাসির মেয়ে তৃণা আমার তুতো বোন। এক দুপুরে তৃণা কখন যে কৃষ্ণা পিসি হয়ে গেল! আমি হয়ে গেলাম মেসো। সেই খেলা খেলে ফেললাম দু'জনে। সেই শুরু। এটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মা পছন্দ করছিল না আমার বারবার কলকাতায় যাওয়া। শেষ পর্যন্ত বন্ধই করতে হল। তৃণা এক দুপুরে জানাল ও প্রেগন্যান্ট। এটা আমার মাথায় আসেনি। শরীর— শিরশিরে আনন্দের মাঝে যে এইসব কাঁটা থাকে, জেনেও বুঝিনি ঝোঁকে পড়ে। আমি পালিয়ে গেলাম আমাদের নর্থবেঙ্গলের বাড়িতে। তৃণা বারবার ফোন করেছে। কান্নাকাটি করেছে। চিঠি লিখেছে। আমি তখন দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। অনেকদিন পরে শুনেছিলাম তৃণা সুইসাইড করেছে। স্বস্তি পেয়েছিলাম আপদ গেছে ভেবে। দোষ যদি হয়েই থাকে, সেটা কি একা আমার? ঘনিষ্ঠতায় ডুবে যেতে যেতে বলেছি 'ভয় নেই, আমি আছি', তো সেটা ভালবাসার মুহূর্তের কথা তৃণা রানি। তুমিও কি নানারকম কথা বলনি সেই সেই মুহূর্তে? তার জন্য আমাকে দোষী করা কেন? ফুঃ! মাঝে একদিন এক রিলেটিভের

সঙ্গে দেখা হল বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। সে আমার চেকনাই দেখে হাম্বা হাম্বা করছিল... গাড়ি ক'টা তোমার? এখন বিদেশে থাক না? বিয়ে? যত এড়িয়ে যেতে চাই, ততই জাপটে জাপটে ধরছে যেন। মানে ঝুলি খুলে তাকে বেড়াল দেখিয়ে দাও এমন অবস্থা আর কী! আর একদিন পীযুষকে দেখেছিলাম শিলিগুড়িতে। ওরে বাবা! দেখেই মুখ ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠে হাওয়া হয়ে গেলাম। আত্মীয় স্বজন আমার মোট্টে নো পসন্দ। এরা খুঁচিয়ে ঘা করে দেয়। কিন্তু মলমটা দেয় না। আজ নিজেই গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম ক্লাস নিতে। ক্লাসের পরে কিছু শপিং ছিল। সোজা মলে গেলাম। সাদার মধ্যে কয়েকটা শার্ট, লাইট ইয়েলো পাঞ্জাবি, কিছু শকস, গোলগলা টি ইত্যাদি বাছাবাছি করছি। মনে হল মেয়েদের পোশাকের ডিপার্টমেন্টের দিকে কিছু মহিলা কলকল করছিল, তাদের মধ্যে সেই মেয়েটিকে দেখে ফেললাম। পোশাক বাছছে মন দিয়ে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, সিওর। সেই মেয়ে। যে আমার গয়েরকাটার বাড়িতে ফিনাইল বেচতে ঢুকেছিল! আজ ওকে ধরতেই হবে। পোশাকগুলো ফেলে ছুটে যেতেই আর পেলাম না। বাকিরা সবাই ছিল। কিন্তু মেয়েটা এইটুকু সময়ের মধ্যে গেল কোথায়। সে আমার কাছে হেল্প চাইতে গিয়েছিল। তাহলে এখন কেন আমার থেকে পালাচ্ছে? ও কি অনির্বাণ বসুর লোক? আমাকে অন্যমনস্ক রেখে অনির্বাণকে বাড়িতে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছিল? নিশ্চয় মেয়েটার কাছে সেদিন ফোন ছিল। কিন্তু যখন আমি ওকে ওর ব্যাগটা খোলালাম, ফোন দেখিনি স্পষ্ট মনে আছে। গুপ্ত জায়গায় ঢুকে ফোনে অনির্বাণকে জানিয়ে দিয়েছিল লেটেস্ট পরিস্থিতি। আর অনির্বাণ ঢুকে আমাকে ফাঁসিতে লটকে দিচ্ছিল। কোন ফাঁকে মেয়েটা পালিয়েছে তখন। অনির্বাণ আর মেয়েটার মধ্যে সংযোগ ছিল। ওদের মধ্যে অবশ্যই যোগসাজস ছিল। অঙ্ক বলছে সেটা থাকতেই হবে! আমার খারাপ লাগে। এসব হঠকারিতায় অনির্বাণ ট্রাকে পিষে মরল। মেয়েটার এগুলো বোঝা উচিত। বেচারি! থাকে কোথায়? দেখতে সুন্দরী। বিয়ে থা করে সুখি হ। নয়তো লাইনে নেমে পড়। রানির হালে থাকবি! বুদ্ধি কি আর গাছে ফলে সুন্দরী!

মল-এ মেয়েটাকে না পেয়ে অস্বস্তিতে ছিলাম। হল কী আমার! হ্যালুতে ভুগতে শুরু করেছি নাকি? চারপাশ থেকে এত এত চাপ থাকলে হ্যালু আসবে, এ আর এমন কী কথা!

আজ ফের আলিপুরদুয়ার ফিরে যাব। মোর্চা বারো ঘণ্টার ডুয়ার্স বন্ধের ডাক দিয়েছে। আবার আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতারা এর বিরোধিতা করে মালবাজারে বৈঠক করবে। রাস্তায় আটকে পড়তে পারি। ভোরে বেরিয়ে যাব। কাল মোর্চা বীরপাড়া, জয়গাঁ, কালচিনিতে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুলিশ রুখে দিয়েছে। চামুর্চি, জলঢাকা, বানারহাট, নাগরাকাটায় অশান্তি শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি ভাল না। এসবের মধ্যে রাস্তায় আটকে গেলে ঝামেলা বাড়বে। সঙ্গে আবার মায়াবী আছে।

আজ ক্লাস নিতে নিতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। লাস্ট বেঞ্চে বসে সেই মেয়েটা ওর দিকে সোজা তাকিয়েছিল। আমি উঠে দাঁড়াতে বলতেই মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। পুরো ক্লাস মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা তখনও সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। মুখে কথা নেই। আমি উন্মাদের মতো অস্থিরতায় চেঁচিয়ে উঠেছি— এদিকে এস। কে তুমি?

—দীপাবলি। দীপাবলি জানা। মেয়েরা গলা কাঁপছিল। ভয় পেয়েছে ও।

—কেন তুমি আমাকে দেখে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ?

> আমার কোনও বান্ধবী ছিল না। ছিল না বলা বোধহয় ভুল হচ্ছে। কামালগাজিতে আমার মাসি ছিল। মায়ের কাজিন। সেখানে যেতাম। মাসির মেয়ে তৃণা আমার তুতো বোন। এক দুপুরে তৃণা কখন যে কৃষ্ণা পিসি হয়ে গেল! আমি হয়ে গেলাম মেসো। সেই খেলা খেলে ফেললাম দু'জনে। সেই শুরু।

—আমি?

মেয়েটার গলা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছিল যেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ কী! এ তো সে মেয়ে না! এটা কে? কী কাণ্ড করে ফেললাম!

—তোমার বাড়ি মাদারিহাটে? তুমি আমাকে সেটাই বলেছিলে।

—না স্যার। আমি ধূপগুড়িতে থাকি। মেয়েটার মুখ ভয়ে বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে —আপনার সঙ্গে কখনই তো আমার কথা হয়নি স্যার।

সম্বিত ফিরে আসছে। ভুল করেছি। এই মেয়ে সেই মেয়ে না। আমি দিনে রাতে ভূত দেখছি। হ্যালু তাড়া করে ফিরছে আমাকে!

—স্যরি, স্যরি, কিছু মনে করো না। আমি একজনের সঙ্গে তোমাকে ভুল করেছি। আচ্ছা, ফিরে আসছি পড়ায়। কী বলছিলাম?

ক্লাসটা আর জমল না। কী হয়েছে আমার! একটু রেস্ট চাই। অতিরিক্ত চিন্তায় ভ্রম দেখছি!

গয়েরকাটার বাড়িতে যখন ঢুকে যাচ্ছি, তখনও মাথা একটা চিন্তায় ডুবে আছে। কেন দেখছি ভুলভাল। সব চিন্তা দূরে সরে গেল মায়াবীকে দেখে। মায়াবী চুলে ফুল গুঁজেছে। হাসি মুখে বেরিয়ে এল আমাকে দেখে। শ্যাম্পু করা চুলের খুচরো ছেলেপিলে কপালের ওপর খেলছে।

বাইরে থেকে এসেই স্নান করা আমার অভ্যেস। মায়াবী বুঝে নিয়েছে আমাকে। স্নানের পরে পাটভাঙা জামা কাপড় পরে নিচ্ছি, কাচের বন্ধ জানালার ওপারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কে? মায়াবী কিচেনে চা করছে। তাহলে ওখানে ...কে? চুল উড়ছে হাওয়ায়। শাড়ির আঁচল দাপাদাপি করে চলেছে বাচ্চা ছেলের মতো। কে ওখানে? দরজাটা খুলে বের হতেই কাউকে দেখতে পেলাম না। চোখের ভুল? আজ বারবার চোখ ভুল দেখছে! ঘরে এসে জানালার দিকে তাকালাম। না, জানালার বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না! অর্থাৎ? কেউ ছিল ওখানে! আমি ভুল দেখিনি!

২৩

ভোরে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তা তখনও সুনসান। মায়াবী ঘুম চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ফোলা ফোলা মুখ। হলুদ সালোয়ার কামিজে ওকে প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছে। গাড়ি স্পিড নিচ্ছে। হাসিমারা কাছাকাছি আসতেই একটা ফোন এল। এ সময় কে ফোন করবে? রাঘব। রাঘবের ফোন। কী হল আবার!

—কী হল? এত ভোরে!

—যে ব্যবসার যা! মাল পাঠাতে পার? টাটকা দেশি গার্ল চাই। ভাল দাম দিচ্ছে।

—টাটকা চায় কে? বাসি খেয়ে খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেছে নাকি?

—যা বল, পারবে? ফাঁকে তালে মোটা টাকা কামিয়ে নিতে পার।

—দেখছি। মায়াবীর দিকে তাকালাম। ভাবলেশহীন চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে।

—আরে দেখি বললে হবে না। দেব— বল।

—বেশ। দেব। কখন নেবে? চট করে দেওয়া যাবে না। একটা বিয়ে সাদির ব্যবস্থা কর। পাত্র নিয়ে এস। কিছু দাও মেয়ের বাপের হাতে। বিয়ে হোক। বউ নিয়ে চলে যাও। ব্যাস!

—হুম, বুদ্ধিটা ভাল দিয়েছ। পাত্র চাই। ঠিক হ্যায়। সঞ্জুকে নিয়ে যাব সাজিয়ে। ও চারটে এরকম বিয়ে করেছে। মাচো ম্যান।

—নিয়ে গিয়ে বিহার না পাঞ্জাব?

—হরিয়ানায় চায় এখন। খুব ডিমান্ড। যাক তুমি দেরি করো না। সঞ্জুকে কবে পাঠাব, জানাও ঘণ্টা বাদে। রাঘব ফোন রেখে দিল। স্পিড বাড়ালাম। প্রথমেই খেয়াল করেনি মায়াবী। খেয়াল হতে খুশি হল না। কেমন একরকম চোখে তাকাল —বাড়িতে যাচ্ছি নাকি? আমার বাবাকে কিছু বলো না।

—কী বলবো না?

—তোমার সঙ্গে...!

—বেশ, তোমার জন্য ভাল ছেলে নিয়ে আসব। তোমার বিয়ে দেব। তুমি আমার বাড়িতে বরের সঙ্গে থাকবে। বর বাইরে কাজে যাবে। তখন তুমি আমার কাছে আসবে তো?

মায়াবী জবাব দিল না। ও আমার কথা

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ভাবছে। বাপকে দেখাতে বিয়েটা হচ্ছে, আসলে ও আমার কাছেই থাকবে। এই মেয়েদের নিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়তে হয়। এরা ফেল কড়ি মাখো তেল নীতিতে বিশ্বাসী নয় মোটে। রুক্মিণীদের মতো মেয়েদের নিয়ে এসব ঝুটমুট ঝামেলা নেই। লতা যেমন! বাপরে! কী আবদার! বিয়ে কর। নিজের ঘরসংসার ছেড়ে চলে এল আমার কাছে। ফেরত পাঠাতে কালঘাম ছুটে গেল। কী করি! শেষে শ্যামলের সঙ্গে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠানো! ওই মেয়েকে? গাড়ি নিয়ে রেডি ছিল কাস্টমার রাধেশ্যাম মাড়োয়ারি। কিনে নিল। কমে ছাড়তে হয়েছিল। মাত্র চল্লিশে। শুনেছি এখন নাকি দুবাইতে আছে। রাতারাতি সব ঝামেলায় আগুন। আগুনে পোড়া ছাইও উড়তে দেখা গেল না। কালো সাদা কোনও ছাই উড়তেও দেখা গেল না। ওর বর আন্দাজ করেছিল লতা ঘর ছেড়েছে প্রেমিকের সঙ্গে। লজ্জা ঘেন্নায় আর খোঁজ করেনি কেউ কখনও। বরটা তো বিয়ে করেছে শুনলাম। সেদিন, এই মাস চারেক হবে, ব্যান্ড বাজিয়ে নতুন বউ নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। লতার একটা মেয়ে ছিল। সেটার কী হল? বাপের কাছে আছে, নাকি মামাবাড়ি চালান করেছে? চালান ব্যাপারটা সব জায়গায় আছে। কিছু বেশি। কিছু কম। মা চালান হল কি সঙ্গে সঙ্গে বাপ মেয়েকে চালান করে দিল। আমাদের দেখে বাড়িতে খুশি ছুঁইয়ে গেল সবাইকে সোনার কাঠি। আপ্যায়নের ত্রুটি রইল না। মায়া এখন টাকা পাঠায় বাড়িতে। গুছিয়ে বসে মায়ার বিয়ের ব্যাপারে কথা বললাম। শুনে বাপ-মায়ের মুখ গেল শুকিয়ে। মেয়ে বিয়ে করছে মানে সংসারে টাকার আমদানি বন্ধ। এটা আন্দাজ করেছিলাম। গপ্পোটা বানাতে বসলাম। পাত্র এখানে আসবে মাঝে মাঝে। মায়া আমার কাছে যেমন কাজ করছে, তেমনই করবে। তবে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। তবে সে জন্য ভেবে লাভ নেই। মায়ার জন্য কিছু টাকা রেখেছি। ওটা বাবাই পাবে। ব্যাস! হাসি ফুটে উঠল বাড়ি জুড়ে।

ফোন করেছি রাঘবকে। সঞ্জুকে শান্তশিষ্ট চেহারায় রূপান্তরিত করে যেন পাঠানো হয়। গাঁয়ে জমিজমা আছে। পাত্র নিজে একজায়গায় চাকরি করে। পয়সার কমতি নেই ইত্যাদি।

যথাসময়ে সঞ্জুকে নিয়ে রাঘব এল ধুতি পরে। গম্ভীর। পাত্রী দেখে মুখ প্রসন্ন করল। সঞ্জু বাপের পাশে বাধ্য ছেলে হয়ে বসে। মায়াবীকে আজ নিজের পছন্দে সাজাতে দিয়েছি। হলুদ ফুল ফুল শাড়ি। এক বিনুনীর শেষে ফিতের ফুল বাঁধা। কপালে লাল টিপ। রাঘব খুশি। বিয়ের দিনক্ষণ দেখেই রেখেছিলাম। পরের দিনই বিয়ে। নম নম করে বিয়ে সারা হল। সোনার হার, দুল, চুড়ি দিয়েছি। উজ্জ্বল চোখে সঞ্জুকে দেখছে মায়া। আর ভাবনা নেই।

বিকেলে মায়াকে নিয়ে চলে গেল ওরা। যাওয়ার আগে একচোট খুশির কান্নাকাটি হল। টোটাল টাকার অর্ধেকটা মিটিয়ে দিল রাঘব। অনেক টাকা। কিছু দিয়ে এলাম মায়ার বাবার হাতে। টাকা এমন জিনিস, সব ঝামেলার মুখে সেলোটেপ আটকে দেয়। ব্যাস! সব খতম। মায়ার বাপকে বলে এলাম মাস দুই থাকছি না। এসে দেখা করব। মায়া তুলে নিলাম নিজের মন থেকে। গাড়িতে উঠে বসলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমি ঊষা উত্থুপের গলায় গানটা শুনছিলাম —না কোই রাত হ্যায়, না কোই দিন ইঁহা / কেয়া ইয়ে অন্ধেরা হ্যায় কিসিকো হ্যায় ধুয়া / আঁখে ধোঁকা খাতি হ্যায় ইয়ে কিসিকো পতা নেই... হ্যায় ইয়ে মায়া... আ ...আ...! হুম, সব মায়া! এই মোহজাল ভেদ করে কাজ করে যাও অধ্যাপক সুভদ্র!

আজ পাড়ার হোটেল থেকে বিরিয়ানি আনালাম। নিখিল ভাল বিরিয়ানি বানাতো। যাক, সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। বিরিয়ানি, লাচ্ছা পরোটা, কষা মাংস খাব আজ। ফ্রেশ হয়ে জাঁকিয়ে বসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে খাচ্ছি, বেয়াদব কানু মিস্ত্রি এসে পাশের চেয়ারে বসল। চেয়ার টানার শব্দ হল ক্যাঁচ। আমি তাকালাম না। কানু ফালতু আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। যেন গুরুঠাকুর। আসলে ওর থেকেই যে দীক্ষা পেয়েছি। বসে থেকে থেকে একসময় চলে যাবে কানু। কিন্তু ফের বড় কোনও কাজের পরে আসে ও। দেখা দিয়ে বাহবা দিয়ে যায়। কানু ফানু এসে গুবলেট করে দিল। মরা মানুষের গন্ধটা এত আঁশটে মার্কা! ধুস, হুইস্কির নেশাটা জমল না! বিরক্ত লাগছে। আরামের তুলতুলে ভাবটা ঝট করে কাঠ কাঠ হয়ে গেল!

সারাদিন যথেষ্ট ঝক্কি গেছে! শারীরিক না হোক, মাথা খাটাতে হয়েছে। মায়ার বাপ-মাকে বোঝানো, রাজি করানো... কম ঝামেলার নাকি! একবার যদি সন্দেহ হত, তাহলে কম ঝামেলা?

আস্তে নেশা জমছে। মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠছে। জীবনে টাকার নেশা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সাপুড়েটা। সেই বিষ আজও আমাকে টানে। জীবনে ওটা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না। আঃ! বিরিয়ানি, কষা মাংস, লাচ্ছা পরোটা...! মায়া এখন কোথায়? রাঘব ওকে নিয়ে জোরসে ভাগো।

রাত বাড়ছে। ঘুম পাচ্ছে। চোখ জড়িয়ে আসছে। বেডরুমটা কোন দিকে যেন...! এই তো আমার বেডরুম। শরীর ছেড়ে দেব বিছানায়। ওয়াও।

আরে! এটা কে শুয়ে আছে আমার বিছানায়! কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে! নাকি সিঁদুর? লাল টুকটুকে শাড়ি পরে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে মায়া। মুখ রক্তে মাখামাখি! মায়া এখানে? আরে, দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। কে??

—স্যার! আমি নিখিল স্যার! মায়ার ভাই...! টোকা পড়ছে —টক! টক!

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

তরঙ্গ উত্তরঙ্গ

৬১

রায়বাহাদুর গঙ্গা ব্যানার্জির ছেলের বিয়ের বউভাত গেছে গতকাল। আজ বাড়িতে অভিনয় করার জন্য আর্যনাট্য সমাজকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। আর্যনাট্য সমাজ হলো শৌখিন থিয়েটার ক্লাব। তাই তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রশ্ন নেই। এক্ষেত্রে আমন্ত্রিত দলকে জামাই আদরে রাখাটাই নিয়ম। গঙ্গা ব্যানার্জি সেদিক দিয়ে কোনও ত্রুটি রাখেন নি। প্রতিটি অভিনেতা-গায়ক-বাদক-পটশিল্পীকে বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। গতকাল বিকেলে দশটা ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়েছেন দলের লোকজনদের আনার জন্য। ভাড়া করেছেন আলাদা একটা বাড়ি। গতকাল বিকেল থেকে সমাজের অভিনেতা-কলাকুশলীরা সেখানে রাজকীয় খাতির যত্নের মধ্যে আছেন। আজ অভিনয় সেরে আগামীকাল দুপুরের খাওয়া সাঙ্গ করে পুনরায় ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ফিরবেন।

এখন মোটে রাত আটটা। অভিনয় শুরু হতে হতে মাঝরাত। শোনা যাচ্ছে দশটার আগে কনসার্ট শুরু হওয়ার আশা নেই। বিরাট বাড়ি, সামনে মস্ত প্রাঙ্গন লোকজনে গমগম করছে। কলকাতা থেকে বিশেষ বিজলী বাতি ভাড়া করে এনেছেন গঙ্গা ব্যানার্জি। নিমন্ত্রিতরা ছাড়াও বহুলোক ভিড় করছে সে আলোর কারসাজি দেখার জন্য। টাউনের মান্যগণ্যরা সবাই প্রায় হাজির হয়েছেন।

হিদারু এদিক ওদিক ঘুরছিল। সেও নিমন্ত্রিত। এঁর তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল। তারপর ভাবল নাটকের ছেলেরা কী করছে দেখে আসবে। গগনেন্দ্রর চিঠি পড়ার পর থেকে দু-দিন বেশ হালকা মনে দিনযাপন করছিল হিদারু। সাত পাতার পেল্লায় চিঠি লিখেছে গগন। তার মধ্যে পাঁচ পাতা জুড়ে ছেলের রকমারী কার্যকলাপের বিবরণ। অনেক দিন ধরে জলপাইগুড়িতে কেন আসা হচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা প্রায় দেড়পাতা। বাকি আধপাতায় আরো সংবাদের সঙ্গে জানিয়েছে যে খুব তাড়াতাড়িই সে আসছে। নিউ ইয়ার পার করে তবে ফিরবে। এই শীতে আবার আগের মত হিদারুর সঙ্গে টাউনে ঘুরে বেড়াবে সে।

গঙ্গা ব্যানার্জির বাড়িতে যে পালার অভিনয় হবে তার নাম 'অভিমন্যু বধ'। অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্যও খরচে কার্পণ্য করেন নি গঙ্গা ব্যানার্জি। কলকাতার নামী বাঁধনদারের কাছ

থেকে সাট আনা হয়েছে। সখীর দলের নাচের জন্য মাস্টার আনা হয়েছে ভবানীপুরের এক ড্রামা ক্লাব থেকে। মাসখানেক ধরে তিনি সন্ধে বেলা নাচ তুলিয়েছেন। সখীর দলের ছেলে যোগারের ব্যাপারে আর্যনাট্যের সুনাম আছে। দরকারে তারা বাইরে থেকে আসা দলের ভালো ভালো ছেলেদের ভাঙিয়ে নেয়।

নাটকের ছেলেরা যে বাড়িটায় রয়েছে সেটা পাশের গলিতে। সেখানে যেতেই নিতাই পালের সঙ্গে দেখা হলো হিদারুর। নিতাইবাবুকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। এই অভিনয়ের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িয়ে আছেন। কলকাতা থেকে সাট আর নাচের মাস্টার যোগারের ক্ষেত্রে তিনিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। হিদারু তাঁকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'কেমন চলছে? মেকাপ শুরু হলো?'

'এই শুরু হলো।' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে জানাল নিতাই পাল।

'ব্যস্ত আছেন বোধহয়?'

'ঠিক ব্যস্ত নয়। আসলে গায়কদের গানের খাতাটা এখনও আসেনি। নিরুপমকে দায়িত্ব দিয়েছি।'

অভিনয়ের সময় গায়ক-দোহারের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইবে। গানের কথাগুলো তাই বড়ো মাপের খাতায় তিন ইঞ্চি হরফে খাগের কলমে লিখতে হবে। তা না হলে পায়ের সামনে থাকা খাতার লেখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবে পড়বে তাঁরা? একজন লোককে রাখতে হবে পাতা উল্টে দেওয়ার জন্য।

'নিশ্চই সময়মত এসে পড়বে।' হিদারু সান্ত্বনা দিল। 'এখনও তো সময় আছে।'

'তা আছে। চা খাবেন?'

'ভেতরে ব্যবস্থা আছে বুঝি?'

'গঙ্গা ব্যানার্জি কোনও কিছুরই অভাব রাখেন নি।' নিতাই পাল এবার হাসলেন। 'চা-সিগারেট-জলখাবার আপনার কত চাই?'

হিদারু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিতাই পাল হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'ওই তো নিরুপম! এসে গেছে!'

তারপর পড়িমরি করে ছুটল রাস্তার দিকে। হিদারু ভাবল মেকাপ কেমন হচ্ছে সেটা ভেতরে গিয়ে দেখবে। উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল তাই। বাইরের ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ঢেকে গেছে। যাদের মেকাপ পড়ে হবে, তাঁরা তুমুল গল্পে মগ্ন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে চায়ের পেয়ালা, টিফিনের প্লেট।

'আরে বঙ্কিমবাবু যে!'

পাশ থেকে অচেনা গলা শুনে হিদারু ফিরে তাকাল। বারান্দার কোণায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা সে-ই বলেছে।

'চিনতে পারছেন না?'

গায়ের শালটা ঠিক করতে করতে লোকটি এগিয়ে এলো। হিদারুর চেনা চেনা লাগছে।

'সিভিল ড্রেসে থাকলে আমাদের চেনা একটু মুশকিল হয়, কী বলেন?'

এবার হিদারু চিনতে পারল। বিনয় মুস্তাফি। টাউনে সেজো দারোগা নামে পরিচিত। টাউন দারোগার দায়িত্বও সামলে থাকেন। জামিন পেয়ে ঘরে ফেরার পর ইনি দু-তিনবার রুটিন মাফিক খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন। গত এক বছর বিনয় মুস্তাফির মুখোমুখি হয় নি হিদারু।

'সত্যিই চিনতে পারি নি।' হিদারু হাসল। 'তা আপনি এখানে?'

'রায়বাহাদুরদের প্রতি স্বদেশীরা তো খুব একটা অনুরাগ দেখায় না। তাই আছি আমরা দু-চারজন।' বিনয় মুস্তাফি সবিনয়ে বললেন। 'একটু সময় হবে আপনার?'

"বিনয় মুস্তাফি কৌটো থেকে ক্যাপস্টান সিগারেট বের করে কুয়াশার মধ্যে খানিকটা ধোঁয়া মিশিয়ে দিয়ে বললেন, 'সম্প্রতি একটা ইনফর্মেশন এসেছে। বদলির ব্যাপারটা না হলে আমি গগনবাবু কিংবা বীরেনের জন্য অপেক্ষা করতাম।' 'আমার কিন্তু খুব কৌতুহল হচ্ছে।' 'ভেরি ন্যাচারাল!' বিনয় মুস্তাফি নরম সুরে বললেন। 'পরশু আপনি বিকেল নাগাদ থানার সামনে অপেক্ষা করবেন।'"

পুলিশের বিগলিত সুর হিদারুকে খুব একটা স্বস্তি দিচ্ছিল না। বিনয় মুস্তাফির কোনও মতলব আছে। হিদারুর সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে সময় কাটাবার লোক নয় মুস্তাফি। অবশ্য পুলিশের দিক থেকে হিদারুর ভয়ের কিছু নেই। সাক্ষীর অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গলিপথ ধরে কয়েক পা এগিয়ে একটা ফাঁকা জমির ধারে দাঁড়ালেন বিনয় মুস্তাফি। কুয়াশা ক্রমশঃ ঘন হয়ে পড়ছে। মুস্তাফি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছলেন।

'গগনেন্দ্রবাবু তো মাথাভাঙ্গায়, তাই না?'

হিদারু মুস্তাফির চোখের দিকে তাকাল। মুস্তাফি এখন সিরিয়াস। হিদারু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'দু-চারদিনের মধ্যে তাঁর টাউনে আসার কথা।'

'আমার বদলির অর্ডার দু-চারদিনের মধ্যেই চলে আসবে। স্পেশাল কনস্টবেলের দায়িত্ব নিয়ে রংপুর যাচ্ছি।'

'আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন?'

'বীরেনবাবুও এখন জার্মানে।' মুস্তাফি আবার নাক মুছল। মনে হয় তাঁকে সর্দিতে ধরেছে। 'গগন বা বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হত, কিন্তু সেটা এখন আর সম্ভব নয়। আপনি পরশু একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন বঙ্কিমবাবু!' নির্দেশের সুরে কথাটা শেষ করলেন তিনি।

'থানায়?' হিদারু একটু ইতস্ততঃ করে বলে।

'না না।' অমায়িক হাসলেন বীরেন মুস্তাফি। 'কাল আমি মালবাজার থানা থেকে একটা জিনিস আনতে যাচ্ছি। পরশু সকালে ফিরে আসব। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি একটা ফাইল ক্লোজড করব।'

'আমার ফাইল?'

'সেটা এখন উহ্য থাক বঙ্কিমবাবু। সিগারেট চলবে?'

হিদারু ধূমপানে অভ্যস্থ নয়। বিনয় মুস্তাফি কৌটো থেকে ক্যাপস্টান সিগারেট বের করে কুয়াশার মধ্যে খানিকটা ধোঁয়া মিশিয়ে দিয়ে বললেন, 'সম্প্রতি একটা ইনফর্মেশন এসেছে। বদলির ব্যাপারটা না হলে আমি গগনবাবু কিংবা বীরেনের জন্য অপেক্ষা করতাম।'

'আমার কিন্তু খুব কৌতুহল হচ্ছে।'

'ভেরি ন্যাচারাল!' বিনয় মুস্তাফি নরম সুরে বললেন। 'পরশু আপনি বিকেল নাগাদ থানার সামনে অপেক্ষা করবেন।'

শীতের রাত ক্রমশঃ গভীর হতে লাগল। গঙ্গা ব্যানার্জির বাড়িতে বেজে উঠল অভিনয়ের প্রথম কনসার্ট। এমনিতে গঙ্গা ব্যানার্জি সাহেবি কেতার মানুষ। গম্ভীর থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু আজ তাঁকে বিলকুল বাঙালি মনে হচ্ছে। হিদারুকে অভিনয় দলের সহযোগী হিসেবে লাগিয়ে দিল নিতাই পাল। ধনুক-গদা সমেত টিনের তীর-তরোয়ালগুলো বহন করার জন্য একজন লোক দরকার ছিল। সে সব অস্ত্র একটা টেবিলে স্তূপকৃত করে হিদারু খাতা নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। নাম মিলিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে তরোয়ালগুলো দিতে হবে। সপ্তরথী মিলে ঘিরে ধরবে অভিমন্যুকে। সুপুরি গাছের বাখারি দিয়ে চমৎকার সব ধনুক বানিয়েছে সমাজের সদস্যরা।

'কী হে? কেমন দেখছ?'

ধড়াচুড়ো পরা কর্ণ এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল হাসিমুখে। হিদারু চিনতে পারছিল না। আশ্চর্য মেকাপ হয়েছে বটে। তারপর চিনতে পেরে খুব হাসল সে। অতটা না হাসলেও চলত। আসলে মনের মধ্যে খুচ খুচ করছিল বিনয় মুস্তাফির কথাগুলো। গোটা রাত ধরে অভিনয় দেখতে দেখতেও সেটা ভুলতে পারল না হিদারু।

কোন ফাইল ক্লোজড করতে চাইছেন বিনয় মুস্তাফি? উপেন ধরা পড়ে নি তো?

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

পৌষ সংক্রান্তির ডুয়ার্স মানেই পিঠেপুলির উৎসব

শৈশব বা কৈশোরের সব কথা আমাদের স্মৃতি ধারণ করে না। কিছু কিছু করা করে। তেমনভাবেই শৈশবে পড়া বা শোনা দুটি লাইন এখনও সকালের আলোর মতো পরিষ্কার মনে করতে পারা যায়। লাইনদুটি আমাদের অনেকের মনেই বোধহয় গেঁথে আছে আশৈশব। 'শীতকাল গীত গাও। যত পার পিঠা খাও'। লাইলদুটোর মধ্যে পিঠের মতো আশ্চর্য এক জিনিস আছে বলেই কি এর কথা ভুলতে পারিনি? হবে হয়ত।

আমাদের ডুয়ার্সে এই পিঠে নামের বস্তুটি বহুকাল ধরেই খাদ্যরসিকদের রসনাকে তৃপ্ত করে এসেছে। মূল উপাদান হল চালের গুঁড়ি। তবে ময়দাও যে ব্যবহার করা হয় না, তা নয়। আমাদের যেমন 'সরু চাউলি', দক্ষিণ ভারতে হল 'ধোসা'। আমরা পিঠে খাই গুড় সহযোগে। আর দক্ষিণের তামিলনাড়ুর মানুষ খান টক জাতীয় খাদ্য বা চাটনি সহযোগে। আমাদের চিতই পিঠে বা আস্কে পিঠের দক্ষিণী নাম হল ইডলি।

আমাদের শৈশবের ডুয়ার্সে একটু গ্রামের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যেত পৌষ পার্বণের সময় পাড়ায় পড়ত ঢেঁকির কাড়াকাড়ি। গোটা মহল্লায় হয়ত দুটো বা তিনটে ঢেঁকি। যাঁরা সেই ঢেঁকির মালিক তাঁরাই ঠিক করে দিতেন কোন বাড়ির পর কোন বাড়ির লোকেরা চালগুঁড়ি তৈরির সুযোগ পাবেন। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি শুরু হয়ে যেত আখ মাড়াইয়ের কাজ। সকাল সন্ধের বাতাস সদ্য তৈরি করা আখের গুড়ের গন্ধে ম ম করত। ছেলেবেলায় ফেলে আসা সেই সুমিষ্ট ঘ্রাণ আজকাল আর পাই না। সম্ভবও নয় বোধহয়। বাবা বাজার থেকে নিয়ে আসত একটা নতুন খেজুর গুড়ের দশসেরি পাই। মাটির তৈরি কলসি যেমন হয়। সেটা আমাদের বাড়ির পৌষপার্বণের পিঠে তৈরিতে খরচ হত।

পিঠেকে তার উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুযায়ী তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগ হল ভাজা পিঠে। দ্বিতীয় বিভাগ ভাপা পিঠে বা সিদ্ধ পিঠে। তৃতীয় বিভাগ সিদ্ধ ভিজে পিঠে। তৃতীয় বিভাগ সিদ্ধ ভিজে পিঠে। ভাজা পিঠের আবার দুটি বিভাগ। অল্প তেলে ভাজা পিঠে এবং তেলে ছাঁকা বা বেশি তেলে ভাজা পিঠে। ভাপা বা সিদ্ধ পিঠে বলতে বোঝায় ফুটন্ত জল থেকে নির্গত বাষ্প দিয়ে সিদ্ধ করা পিঠে। চিনি, গুড় ও এলাচ সহযোগে গাঢ় ফুটন্ত দুধে পিঠে সিদ্ধ করলে সেই পিঠেকে সিদ্ধ ভিজে পিঠে বলা হয়। আবার বেশি তেলে ভাজা দু'এক ধরনের পিঠেকে চিনির রসে ডুবিয়ে ভিজেসিদ্ধ পিঠে হিসেবে ধরা হয়।

আমাদের ছোটবেলায় ডুয়ার্সে সবরকম পিঠের চল দেখেছি। অসমের বিহু উৎসবেও পিঠের ভূমিকা আছে। মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে পাত্রীর বাড়িতে ফল, মিস্টির সঙ্গে অবশ্যই পাকানো গুড়পিঠে পাঠাতে হয়। নইলে পাত্রপক্ষের সম্মানহানি ঘটতে পারে। আমাদের বাঙালি হিন্দুদের পৌষসংক্রান্তির আগের দিন ভাজাপিঠে আর সংক্রান্তির দিন সিদ্ধপিঠে, ভিজেসিদ্ধ পিঠে আবশ্যিক খাদ্য। কার্তিক মাসে কালীপুজোর

> 'আমাদের বাঙালি হিন্দুদের পৌষসংক্রান্তির আগের দিন ভাজাপিঠে আর সংক্রান্তির দিন সিদ্ধপিঠে, ভিজেসিদ্ধ পিঠে আবশ্যিক খাদ্য। কার্তিক মাসে কালীপুজোর পরদিন গো-পার্বণ অনুষ্ঠানে গরু বাছুরকে অবশ্যই পিঠে খাওয়াতে হয়। বাঙালি হিন্দুদের শিশুর ষষ্ঠীপুজোয় গুড়পিঠে দেবার নিয়ম আছে।'

পরদিন গো-পার্বণ অনুষ্ঠানে গরু বাছুরকে অবশ্যই পিঠে খাওয়াতে হয়। বাঙালি হিন্দুদের শিশুর ষষ্ঠীপুজোয় গুড়পিঠে দেবার নিয়ম আছে। ওদিকে ওড়িশায় বেশি প্রচলিত হল বিরি চাউলা চাকুলা পিঠে। এটি আমাদের সরু চাউলি পিঠের মতোই। সুজি মন্ডা, পিঠে, ভাপা পিঠের অন্তর্গত। আমাদের আস্কে পিঠের মতোই হল নদীয়ার চিতই পিঠে। আটা চাকুলি পিঠা চালের পরিবর্তে আটা দিয়ে বানানো হয়। চন্দ্রকান্তি পিঠা আমাদের পাটিসাপটার মতোই। এছাড়া সুজিদাহি, মুগাপিঠে ব কান্তিপিঠে হল ওড়িশার বিখ্যাত পিঠে।

কিশোর বয়সের কথা মনে পড়ে। সংক্রান্তির দু'দিন আগে থেকে দেখতাম মা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকত পিঠে বানানো নিয়ে। চালের গুঁড়োর সাদা পিঠে তো হতই গোল গোল চাকতির মতো। ভাজা হত নতুন কেনা বিশেষ ধরনের মাটোইর সরায়, যাতে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা উঠে আসে। তারপর নতুন গুড় আর নারকেল কোরা দিয়ে গরম গরম সেই পিঠে খাওয়া হত। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হত অনবদ্য গড়নের পুলি। ভিতরে থাকবে নারকেলের 'ছাঁই'। এই শব্দটা মায়ের মুখেই শুনতাম। অভিধানে খুঁজে লাভ নেই। ব্যাপারটা হল, নারকেল কোরা চিনি-গুড় দিয়ে জ্বাল দিয়ে নাড়ুর পাকের চেয়ে একটু আগে নরম-সরম নামানো। নারকেল ছাড়াও ক্ষীর থাকত কখনও কখনও।

সেইরকম হল পাটিসাপটা। কখনও নারকেলের পুর তার অভ্যন্তরে। কখনও ক্ষীর। শুকনো পাটিসাপটাও খাওয়া যায়, আবার জম্পেশ করে তার উপর ঘন দুধের মিশেল দিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে পাটিসাপটার পায়েস। পুলির পায়েস হত জ্বাল হওয়া ঘন দুধে দু'চারবার ফুটিয়ে। সেই পায়েসের সঙ্গে মিশে থাকত আরও দু'চারটে উপাদান। মায়ের নিজে হাতে কাটা চষি। নতুন আতপের গন্ধভরা সেই সব পুলি-চষির পায়েসের স্বাদের কোনও তুলনা

> "পৌষ সংক্রান্তির পার্বণের সময় ডুয়ার্সের অনেক ঘরেই তখন শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে নতুন চালের গুঁড়োগুলে আলপনা দেওয়া হত। ঘট বসিয়ে সিঁদুর দিয়ে ছোটখাট একটা পুজো মতো করে নেওয়া হত বহু বাড়িতে। সামনে রাখা থালা থেকে নতুন চালের চালের প্রসাদ কাকে নিয়ে গেলেই পুজো সাঙ্গ।"

ছিল না।

শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়, পৌষ সংক্রান্তির পার্বণের সময় ডুয়ার্সের অনেক ঘরেই তখন শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে নতুন চালের গুঁড়োগুলে আলপনা দেওয়া হত। ঘট বসিয়ে সিঁদুর দিয়ে ছোটখাট একটা পুজো মতো করে নেওয়া হত বহু বাড়িতে। সামনে রাখা থালা থেকে নতুন চালের চালের প্রসাদ কাকে নিয়ে গেলেই পুজো সাঙ্গ। সব কিছুই নতুন চাল দিয়ে করা হত। তাই মনে হয় অঘ্রাণের নবান্নের সঙ্গে পৌষ সংক্রান্তির একটা সংযোগ ছিল কোথাও হয়ত বা। সেদিন গরুর খুব আদর। স্নান করিয়ে কপালে সিঁদুর দিয়ে গায়ে আলপনার সরঞ্জামে সাদা সাদা ছাপ দেওয়া হত মাটির কলকে দিয়ে।

মায়ের ছিল নতুন নতুন পদ বানাবার শখ। শুধু পিঠেপুলি নয়, আমাদের বাড়িতে মাকে একটা স্পেশাল জিনিস করতে দেখতাম পৌষ সংক্রান্তির সময়। আমাদের দশ বারোজন বন্ধুদের গ্রুপটার ডাক পড়ত আমাদের বাড়িতে। একবার তাদের জন্য বাটিতে বাটিতে করে এল ঘন পায়েসের মতো কিছু একটা খাবার। স্বাদে গন্ধে মুগ্ধ সকলে। মা মুখ টিপে হেসে বলত, বল তো কী খাচ্ছিস তোরা? বন্ধুরা ভেবে চিন্তে বলত, কি, রাবড়ি? প্রসন্ন হয়ে উঠত মায়ের মুখ। বন্ধুদের উত্তর ঠিক হয়নি বলে। হাসির বিভা ছড়িয়ে পড়ত মুখে। বলত, এ হল বাঁধাকপির পায়েস।

সকলে জানতে চাইত, কী করে করতে হয় সে জিনিস? মা তখন গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলত, প্রথমে বাঁধাকপির সাদা পাতাগুলোর শিরাগুলো যথাসম্ভব ফেলে দিয়ে ছেঁড়া পাতার স্তূপটি ভাপে সিদ্ধ করে জলে ফেলে দিতে হয়। পরে দুধে দীর্ঘসময় পাতাগুলি জ্বাল দিয়ে নামিয়ে নিতে হয়। তখন সেটা দেখতেও রাবড়ি। খেতেও। মা আরও চমৎকার কিছু জিনিস বানাত। যেমন কমলালেবুর পায়েস। সেমাইয়ের পায়েস। সেমাইয়ের পায়েস। পয়লা পৌষে বন্ধুরা হামলে পড়ে বলত, কাকিমা, এবার কিসের পায়েস? মা বলত না কিছু। গোপনীয়তার ভান করে হাসত মুখ টিপে।

আমার ঠাকুমাকেও দেখেছি শীতের মরশুমে দারুণ পিঠে বানাতে। সে বাড়িতে অবশ্য পুলিই প্রধান। মুগের পুলির কথা আলাদা করে বলতে হয়। ভাজা মুগের ডাল আধসেদ্ধ করে নিয়ে নুন মিশিয়ে ময়দার মতো মেখে তৈরি হয় খোল। তার মধ্যে পুর দিতে হয় নারকেলের ছাঁই। এরপর ঘি বা শাদা তেলে ভেজে তৈরি হয় গরম গরম ও নোনতা খাবার। সে বাড়িতে দেখেছি 'গঙ্গাজলি' নামে একটি মজার জিনিস। ঝুনো নারকেল বটিতে কুচি কুচি করে কেটে জলে ফেলতে হত। বেশ ভিজিয়ে কচলে ধুয়ে তেল অংশ বের করা হত। এরপর জ্বাল দেওয়ার পালা। জ্বাল হত প্রচুর চিনি দিয়ে কিন্তু কম আঁচে। চিনি থাকত সাদা ধবধবে। ভেজে খরখরে মতো হলে নামিয়ে শিলে বাটতে হত পাউডারের মতো মিহি গুঁড়ো করে। সেটা একটু গভীর ছোট ছাঁচে চেপে চেপে সন্দেশ করে তুলতে হত। কাজটা করা হত খেতে দেবার সময়। মুখে আলতোভাবে দিলেই গলে জল হয়ে যেত।

আমাদের ডুয়ার্সের আর বাংলাদেশের পিঠের নামকরণ এবং বানানোর পদ্ধতি প্রায় এক রকম। বড়া ধরনের পিঠেগুলো কম তেলে ভাজা পিঠে। যেমন লাউপিঠে, মুলোপিঠে। এছাড়া সরু চাউলি, আস্কে বা চিতই পিঠে কম তেলে ভাজা পিঠে। পুরপিঠে মূলত ভাপা পিঠে। ডুয়ার্সের গুড় পিঠে বাংলাদেশে পাকানো নামে পরিচিত। আমরা যাকে মুঠো পিঠে বলে থাকি বাংলাদেশে তাই চাপড়ি পিঠা। আমাদের ক্ষীরপিঠে হল বাংলাদেশের মালাই পিঠা। আদতে পিঠে পরিচয়ে যেগুলি রাখা আছে সেগুলি দুই বাংলায় প্রচলিত। মোট কথা, পিঠা পরিচয় যাদের সেগুলিই খাঁটি বাংলাদেশি পিঠা।

আমগুড়ি পানবাড়ি ধানবাড়ি

আমগুড়িতে কেউ যায় না। পানবাড়িতেও যায় না কেউ। আমি অবশ্য স্থানীয় মানুষের কথা বলছি না। কিন্তু পর্যটকেরা গাড়ি হাঁকিয়ে, ক্যামেরা নিয়ে আমগুড়ি-পানবাড়ির ওপর দিয়ে রামশাই গেলেও ওসব জায়গায় থামবার কথা ভাবে না। থামার কারণও নেই বিশেষ। রামশাই গেলে জঙ্গল আছে, জলঢাকার চরে ভ্রাম্যমান গন্ডার আছে, গরুর গাড়ি চেপে সাফারি আছে — কিন্তু পানবাড়ি বা আমগুড়িতে আছেটা কী?

সত্যিই কিছু নেই। কিছু মানুষ, কিছু বাড়িঘর, দোকান-স্কুল আর ছোট ছোট চা বাগান ছাড়া। একটা বড়ো চা বাগান বরং রামশাইতেই গেলেই দেখা যাবে বাঁধ ঘেঁসে। যাদবপুর টি গার্ডেন। যাদবপুর নামটা ডুয়ার্সে বেমানান। 'পুর' না হয়ে 'গুড়ি' কিংবা 'ডাঙ্গি' হলে ভালো হত। মনে হয় বাগান স্থাপকের বাড়ি ছিল যাদবপুরে, অথবা তিনি ছিলেন বেশ রোমান্টিক।

আমগুড়ি এলাকায় অনেকে ছোট ছোট চা বাগান বানিয়েছেন। কাছেই চায়ের ফ্যাক্টরি। দালাল মারফৎ তারা ছোট বাগান থেকে চা কেনে। এইসব বাগানের পাতা তোলার জন্য সাময়িক শ্রমিক দরকার হয় বলে এলাকায় বাড়তি রোজগারের রাস্তা হয়েছে। পাতা বোঝাই করে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছোট ট্রাক কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে কেউ কেউ। কাঁচা পাতার দাম তাই এখানে একটা বিষয়। এর আগে চা বাগানের পাতার দর নিয়ে স্থানীয় লোকদের কিছু যায় আসত না। বাগানগুলোর নিজস্ব ব্যাপার ছিল সে সব। কিন্তু ছোট বাগানগুলো লোকজনের বাগানের মত। টি এস্টেট নয়। এ যেন 'আম' বাগান। এই ছোট ছোট ব্যক্তিগত দু-চার বিঘের বাগানগুলো চা শিল্পের সঙ্গে গ্রামের মানুষকে জড়িয়ে ফেলছে।

> "ডুয়ার্সের রাজবংশীরা বাসী জিলিপি খেতে ভালোবাসে। মিষ্টির দোকানে কয়েক দিনের বাসী জিলিপি থাকবেই। মিষ্টি খাওয়ার অভ্যেস থাকলে দেখবেন বাসী জিলিপি খাওয়া একটা নেশার মত। টুক টুক করে খেয়েই যাবেন।"

আমি যাচ্ছি মেরুণ রঙের স্কুটির পেছনে বসে। চালক হলেন আমগুড়ির বাসিন্দা তরুণ বাদল রায়। ইতিহাসের ছাত্র। এমএ-তে প্রথম শ্রেণি পাওয়ার পর গবেষণায় ঢুকেছে। তাদের বাড়িতে যাচ্ছি। ময়নাগুড়ির পাব্লিক বাস স্ট্যান্ড পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে রামশাই। ডুয়ার্সের পর্যটকেরা এ পথ চেনেন।

পাকা রাস্তা মন্দ চওড়া নয়। কিন্তু সে তো মূল পথ। বাদলের বাড়ি যেতে হবে দু-পাশে ধানবাড়ির মধ্যে দিয়ে মেঠো পথ ধরে। শীতকাল বলেই স্কুটি হাঁকিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, লাফাত লাফাতে যাওয়া যাচ্ছে। তারপর গাড়ি থামিয়ে একটা বাড়ির উঠোন দিয়ে এবং আরো দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে তাঁদের চা বাগানে। বাগানের শেষে জমি ঢালু হয়ে সোজা নদীতে। বোধহয় দু-ভাগে ভাগ হয়ে আসা ধরলার একটা ধারা। অল্প জল। তলা দেখা যাচ্ছে।

আমগুড়িতে হাইস্কুল আছে। তারপর কলেজে পড়তে হলে ময়নাগুড়ি। টোটো চালু হওয়ার পর ময়নাগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ অনেক সোজা হয়েছে। তবে টোটোয় খরচ বেশি। ছোট বাস মোটামুটি চলে। একটা স্টেট বাস সকাল

বিকেল জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাতায়াত করছে এখন। বুঝলাম যে মিহির গোস্বামী লড়ে যাচ্ছেন।

পানবাড়ির বাজারে বসে রসগোল্লা খেলাম। ডুয়ার্সের রাজবংশীরা বাসী জিলিপি খেতে ভালোবাসে। মিষ্টির দোকানে কয়েক দিনের বাসী জিলিপি থাকবেই। মিষ্টি খাওয়ার অভ্যেস থাকলে দেখবেন বাসী জিলিপি খাওয়া একটা নেশার মত। টুক টুক করে খেয়েই যাবেন। রসগোল্লা খাওয়ার কারণ সেটা গরম ছিল। বাজারগুলো একই রকম। লোকজন ছাড়া আমগুড়ির বাজারের সঙ্গে পানবাড়ির বাজারের কোনও পার্থক্য নেই। সব বাজারেই পাকা এবং বড়োসরো আকারের একটা গালা মালের দোকান থাকে। সেই মুদির দোকানটিতে প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায়। কোথায় জানি এমন একটা দোকানে কিছু ওষুধপত্রও দেখেছিলাম। এখানেও যেন শিশুর ডায়াপারের পাশে লিঙ্গবর্ধক তেলের প্যাকেট চোখে পড়ল। দু-এর মধ্যে যে একটা বহুদূর প্রসারী সম্পর্ক ছিল, সেটা লেখার সময় মনে হচ্ছে এখন।

ধান মন্দ হয় নি। ধানবাড়িতে হরেক কচি পাতার ছড়াছড়ি। শীতের সব্জি। রামশাই-এর কাছে, জলঢাকা ঘেঁসে জেলেদের কিছু ঘরবাড়ি। কিন্তু আগের মত মাছ আর দেয় না নদী। বাজারগুলোয় চালানি মাছের আধিক্য। শুঁটকি মাছের কদর সাঙ্ঘাতিক। এক শুঁটকির পসারিকে জিগ্যেস করে জানলাম সিদলও পাওয়া যায়। শুঁটকি মাছ থেকে তৈরি করা সিদল হলো রাজবংশীদের অন্যতম ফেবারিট খাদ্য।

যাদবপুর বাগানে মালপত্র নিয়ে আসার জন্য একদা রেলপথ ছিল। লাটাগুড়ি থেকে আসত মালগাড়ি। বাগানের রাস্তায় ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো লাইনের অবশিষ্টাংশ আছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখি। ফ্যাক্টরির কাছে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দু-তিন জনের কাছে জানতে চাইলাম লাইনটা কোথায়। দেখলাম তাঁরা কেউ ব্যাপারটা জানেই না। একটু পরে একজন বয়স্ক লোক স্বীকার করলেন যে লাইনটা ছিল। আর ট্রেনটা থামত যেখানে, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। লাইন অনেক দিন আগেই চুরি হয়ে গেছে।

রেল লাইন চুরি তেমন কোনও চমকে ওঠার মত কথা নয়। এ পথে অনেক শতাব্দী প্রাচীন বৃক্ষ চুরি হয়ে গেছে। কী জানি ছড়িয়ে দেয় গাছের গায়ে— গাছ মরে যায় একটু একটু করে। মরে গেলে কাটতে কোনও ঝামেলা নেই। মরা কাঠ লাখ টাকা।

আমবাড়ি থেকে পানবাড়ির যেতে বাঁ দিকে একটা কাঁচা পথে ঘুরে গেলাম। জলঢাকার পাড়ে পিকনিক স্পট তৈরি হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয় হয় নি তেমন। গিয়ে দেখলাম নদীর পাড়ে অনেকটা জায়গা। একটা বনাঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা। স্বল্পতোয়া জলঢাকা হেঁটে পেরিয়ে যাচ্ছে কাঠকুড়ুনি মহিলা। ভবিষ্যতে গাছগুলো আরো বড়ো হলে স্থানটি চড়ুইভাতির পক্ষে দুরন্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। শীত যখন জমিয়ে থাকবে তখন অবশ্যি এখানে চোখবুঁজে চলে আসতে পারেন পিকনিকের গাড়ি নিয়ে। এখনই।

জলঢাকার বাঁধের ওপর দাঁড়ালে নদীচরে গন্ডার দেখাটা অসম্ভব নয়— কিন্তু সেটা নিষিদ্ধ। বাঁধের তলা দিয়ে চললাম কালীপুরের দিকে গেলাম চা বাগান ঘেঁসে, কখনও বাগানের একটু ভেতর দিয়ে। কালীপুর বনবস্তির 'নাচুনি আখড়া'র মঞ্চটি ফাঁকা। টুরিস্টদের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার গাড়িগুলো এক কোণে ফেলে রাখা। ধু ধু দুপুর। কেউ কোথাও নেই। চুপচাপ বসে থাকি। রামশাইতে পর্যটক আসায় আমগুড়ি-পানবাড়ির লোকের দুটো পয়সা হচ্ছে? মোটেই না। টুরিস্টের খরচ করা টাকার

> "গাড়ি ঘিরে পনের কুড়িজন। গাড়ি ছুটল গর্ভবতীকে নিয়ে। পেছনে দুটো বাইকে ছ-জন আরো। ডুয়ার্সের সামান্য এক গ্রামের পথে এই দৃশ্যটা দেখে মনে ভারি আরাম হলো। এই তো মানবধর্ম! একজনের সমস্যায় চলে এসেছে কয়েক গন্ডা মানুষ।"

সাড়ে পনের আনাই যারা নিয়ে যায় তাঁরা কী করে থাকবে আমগুড়িতে? কিংবা পানবাড়িতে? রামশাই সমেত এসব এলাকার মানুষের যাওয়া আসা একদা ছিল 'বনের ভিতর দিয়ে'। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছিল পায়ে চলা পথ। স্বাধীনতার আগে রাজবংশী যুবকেরা সরকারের ওপর হামলা চালিয়ে লুকিয়ে পড়তে এইসব পথ ধরে অরণ্যের গভীরে। চলে যেত ভিন্ন জায়গায়।

স্বাধীনতার পরেও এইসব পথকে করিডোর করেছিল কেএলও জঙ্গীরা। প্রশাসন বিস্তর ঘোল খেয়েছিল। এখন বোধহয় রামশাই থেকে জঙ্গলে চলে যাওয়া সে সব অতি শীর্ণ পায়ে চলা পথের হদিশ পুলিশ-প্রশাসন পেয়ে গেছে। তা ছাড়া রামশাই-পানবাড়ির মানুষ এখন জঙ্গলে ঢোকেই না তেমন। আমগুড়ি টু রামশাই তো জঙ্গলের মধ্যেই ছিল বহুকাল ধরে। হালকা-পলকা জঙ্গলে পর্যটকেরা ঢোকে। জঙ্গলে ঢোকার বদলে তাঁরা রামশাই থেকে বাসে উঠে চলে আসে ময়নাগুড়ি। চমৎকার রাস্তা। আপদে বিপদে প্রথম ভরসা ময়নাগুড়িই বটে!

সন্ধে বেলায় আমগুড়ি হাট। দোকান পাটের আড়ালে মূল বাজারটা ঠিক বুঝতে পারি নি প্রথমে। দুটো দোকানের ফাঁক দিয়ে কয়েক পা এগোতেই দেখি ধুন্ধুমার জমেছে। শীতকালের হাট দেখে মজা আছে। রকমারী সব্জি। বাইরে পথের দু-ধারেও লম্বা বাজার। আমার কেনার কিছুই ছিল না। কেবল ঘুরে বেড়ালাম। এ হাট পানবাড়ি কিংবা হুসলুডাঙ্গাতেও হতে পারত। এ সব ছোট ছোট হাটের তিনটে কমন জিনিস হলো চর্বির বড়ার দোকান, ছোট্ট মন্দির লাগোয়া গাঁজার মজলিশ, অন্ততঃ একখানা গুপ্তদারুর দোকান। এক কিশোরকে দেখলাম কানে হেডফোন গুঁজে চুল ছাঁটাচ্ছে সেলুনে।

ঘুরে ঘুরে তিনটে জায়গা চোখে পড়ার পর নিশ্চিত হলাম।

আমগুড়ি থেকে এবার রথের হাট হয়ে চূড়াভান্ডার। আঁকাবাঁকা গ্রামীণ সড়ক। দু-একটা পাড়া। স্ট্রিট লাইট বলে কিছু হয় না এসব জায়গায়। ভুতুড়ে-ছায়ামাখা পথ দিয়ে স্কুটি চলছে পঁচিশ-তিরিশে। চাঁদের আলোয় আঁকাবাঁকা পথে এর চেয়ে জোরে চলা অসম্ভব। লোকালয় থেকে ছিটকে আসছে টেলিভিশনের শব্দ। দু-পাশে কখনও বিস্তির্ণ ধানবাড়ি। এখানে কেউ লিটিল ম্যাগাজিন পড়ে? শক্তির কবিতা? কলকাতার পেপার?

ধুস! ওসব শহুরে ব্যাপারে আমগুড়ি-পানবাড়ি-রামশাইয়ের মোটেই ইন্টারেস্ট নেই। যদি পাল্লা দিতে হয় তবে মেগা সিরিয়ালের কথায় এসো বাপু! ওই যে বলছিলাম না টেলিভিশনের শব্দ ছিটকে আসছে! ওগুলো বাংলা মেগাসিরিয়ালের সংলাপ আর মিউজিক। সবার ঘরে না থাকলেও অনেকের ঘরেই আছে ডিশ অ্যান্টেনা আর টিভি সেট। আলো-অন্ধকার মাখান পথে সাইকেল চালক চলে গেল পকেটে রাখা মোবাইল থেকে গান বাজাতে বাজাতে। হেড লাইট জ্বালিয়ে জমি চষছে ট্রাক্টর।

এবার একটা ছোট জটলা দেখে চালক বাদল রায় স্কুটি থামায়। একটা গাড়িও আছে। অ্যাম্বুলেন্স। সরকারী মাতৃযান। প্রসূতির বেদনা উঠেছে— তাঁকে নিয়ে ছুটবে ময়নাগুড়ি ব্লক হসপিটালে। গাড়ি ঘিরে পনের কুড়িজন। গাড়ি ছুটল গর্ভবতীকে নিয়ে। পেছনে দুটো বাইকে ছ-জন আরো। ডুয়ার্সের সামান্য এক গ্রামের পথে এই দৃশ্যটা দেখে মনে ভারি আরাম হলো। এই তো মানবধর্ম! একজনের সমস্যায় চলে এসেছে কয়েক গন্ডা মানুষ।

মাতৃযান যাচ্ছে। পেছনে দুটো বাইক। রথেরহাট ছুঁয়ে ঝাঝাঙ্গি হয়ে চলে যাবে ওরা ময়নাগুড়ির দিকে। আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল একটা জায়গায় এসে। দূরে জাতীয় সড়কে ভ্রাম্যমান গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। একটি শিশুর আগমনকে নিশ্চিত করতে চলে গেল ওরা। সময়টা যদি সন্ধে না হয় রাত দুটো হত, তাহলেও যেত অন্ততঃ একটা বাইক। ভারতের হাজারো গ্রামের সঙ্গে একসুরে মিলে যায় পানবাড়ি-আমগুড়ির জীবন। এইখানেই। চাঁদের আলোয় দু-পাশের ধানবাড়ি দেখতে দেখতে বেশ রোমান্টিক মনে হলো নিজেকে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

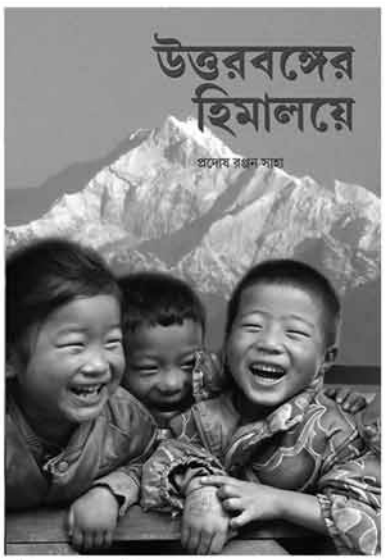

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। মূল্য ২০০ টাকা

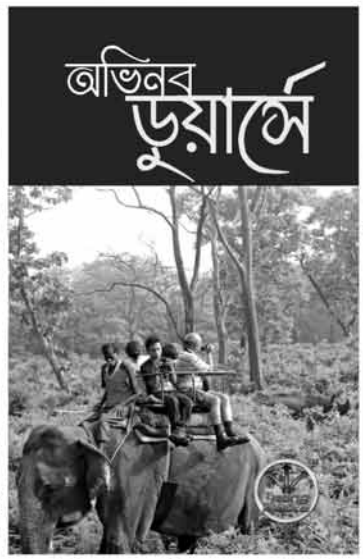

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

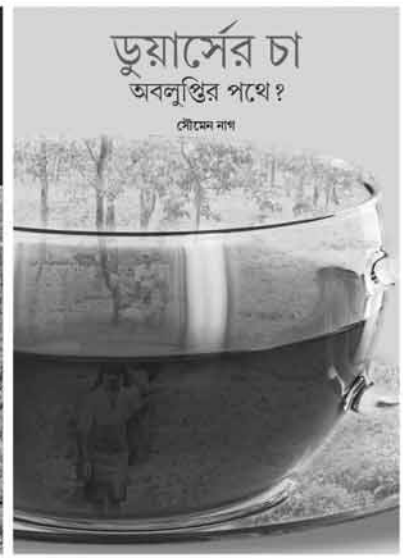

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

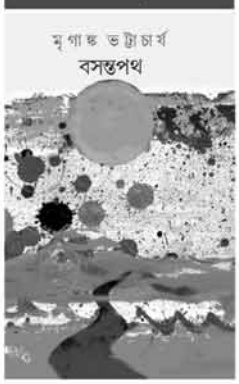

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

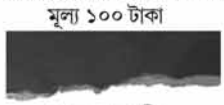

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

কলকাতায়: দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-18 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-২০। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.